মানগানু উপত্যকার বেড়াল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ন ব প ত্র প্র কা শ ন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ঃ আগষ্ট / ১৯৬১

প্রকাশক ঃ প্রসন্ন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ দুর্গাদাস পাণ্ডা, এম. এ. বি. এড্
দেবাশীষ প্রেস
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট / কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

॥ এক ॥

খুব সকাল সকাল ওর উঠে পড়ার অভ্যাস। মেয়েটা তখনও ঘুমিয়ে থাকে। আজ সে ঘুম থেকে উঠে সোজা সমুদ্রের ধারে চলে যায়। আবছামতো অন্ধকার, গাছপালার ভেতর। শেষ প্রহরে মোরগের ডাক সে শুনতে পায় যেতে যেতে। মাথায় টুপিটা সে যেতে যেতেই একবার ঠিক করে নেয়। রাত পোহাতে আরও কিছু সময় বাকি। এর ভেতরে মাছটা তুলে ফেলতে হবে। মাছটা দেখতে দালাল কামারু আসবে। এসে জলের ভেতর মাছের আঁশ দেখে টের পায় কত বড় মাছ শিকার করে ফিরেছে জন সামসের।

সামসের সারারাত ভালো ঘুমোতেও পারে নি। এতবড় মাছটাকে কবজা করতে ছ'রাত সমুদ্রেই কেটে গেছে। ছ'দিন সে কাজে যেতে পারে নি। সাবিনা খুব ভাবনায় পড়েছিল। টিলার ওপর বসেছিল, আর যতদূরে চোখ যায় কেবল দেখত, সেই ছোট্ট সাদামতো নৌকাটা বাপের দেখা যায় কিনা। ফিরে আসার পর আবিন চাচা খুব গালমন্দ করেছে। এত লোভ তোর ভালো না সামসের। মেয়েটাকে একা ফেলে চলে যাস!

—তা কি করি চাচা। আটকে গেলে কি করি!

—তোর তো এত দেরি হয় না।

—শয়তানটা যে এত ঘোরাবে কে জানত।

—যত বলি, শোনে না। সাঁঝ লেগে গেল, বলি ফিরবে, কথা কিছুতেই শোনে না। কেবল বলে, বাবা আসছে না কেন?

সামসের বলল, তারপর কি করলে চাচা।

—কি আর করি! টিউলিপ ফুল এনে দেব বললাম।

—ভুলে গেল?

—অত সহজ ভেবেছ তোমার মেয়েকে !

—কি বললে আর !

—বললাম, আমার দোস্ আসছে ! দোসের একটা পোষা প্যাংগোলিন আছে। ওটা এবার তোর কাছে রেখে যেতে বলব।

—শুনলে !

সামসের কথা বলছিল, আর নৌকাটার গেরাফি ওপরে তুলে আনছে। তারপর বালির ভেতর ফেলে দিতেই গেরাফিটা আটকে গেল। এবং তার কাজ তখন পাল, ছোট্ট করমঁরাত পাখিটাকে তুলে নেওয়া, সে বার বার ডেকেও মেয়ের সাড়া পাচ্ছিল না। মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল। দুশ্চিন্তায় মেয়েটা কেমন হয়ে গেছিল। দ্বীপের স্বজাতিরাও ভেবেছিল, কি হল, দু-দুটো দিন গভীর জলায় ! অবশ্য সামসেরের এমন আরও অনেকবার হয়েছে।

সাবিনা তো গতকাল কিছু খায়ই নি। কেবল মা যেমন তাকে ফেলে অন্য একটা দ্বীপে উঠে গেছে, বাবাও ফাঁকি দিয়ে তেমনি উঠে গেল ভেবেছে। তার অন্য ভয় নেই। সে দু'একবার বাপের সঙ্গে মাছ শিকারে গেছে। বাপ কি করে যে জল দেখে টের পায়, কতদূরে কোনদিকে গেলে তার দ্বীপ,—কিছুই বোঝা যায় না, তবু বাপ দাঁড়িয়ে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হাল ঘুরিয়ে দেয়। এবং বাপকে মনে হয় তখন এক আশ্চর্য যাদুকর। কিছুক্ষণের ভেতরেই সে দেখতে পায় দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু টিলা, মাথায় তার গীর্জা এবং ক্রস। দেখলেই সে বুকে ক্রস টানে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

—ও সাবিনা, আয় মা ! করমরাঁত দেখ তোকে খুঁজছে।

সাবিনা আর তখন রাগ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। খাঁড়িতে জন সামসের দু'দিন পর ফিরে এসেছে শুনতে পেয়েই তার কিছু স্বজাতি ছুটে গিয়েছিল। সাবিনা বাপকে দেখেও একটা কথা বলে নি।

সামসের বলেছিল, ইয়া বড় !

তবু সাবিনা নড়ে নি।

—আয় দেখে যা, লেজটা কি নাড়ছে ছাখ।

সাবিনা দেখছিল, সব লোক জলে দাঁড়িয়ে অতিকায় মাছটাকে দেখছে।

সামসের হয় তো মাছটাকে কবজা করেছে কিভাবে সেই গল্প বলতে উদ্যত হত। কিন্তু ছ'দিন, ছ'রাত না ঘুম, না খাওয়া। শরীর টিঁকছিল না। মাছটাকে খাঁড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল উত্তেজনার শেষ। যখন সবাই সামসেরের শিকার দেখে বিস্মিত, এবং এত বড় জাঁদরেল জেনারেলকে ধরে ফেলতে পারে এক সামসেরই, তখন কেমন তার সব উত্তেজনা মিইয়ে গিয়েছিল। সে মেয়েটাকে হাতে ধরে নিয়ে এসেছিল, ইচ্ছে ছিল সবার আগে সাবিনাকে দেখাবে ইবলিশটা কি কুতকুতে চোখে ফুটকরি কাটছে। দেখাবে, পাখার মতো কেমন জলে নিশ্চিন্তে লেজ নাড়ছে। কিন্তু যখন দেখাতে পারল না—কি আর করে, একবারে নৌকার পাটতনে এনে বলেছে, নে, পাখিটা ধর। ছাখ, কত বড় ছাখ!

সাবিনা উবু হয়ে জলের ভেতর অতিকায় দানবটাকে দেখে কেমন ফিক করে হেসে দিয়েছিল। —সত্যি। বাবাকে মনে হয়েছিল দ্বীপের পুরোহিতের চেয়েও প্রবল মানুষ। সে করমর্দাঁত পাখিটাকে বগলে চেপে লাফাতে লাফাতে নেমে গিয়েছিল নিচে। তারপর সে তার পরিচিত সব বন্ধুদের ডেকে এনে দেখিয়েছিল। সবাইকে নৌকায় উঠতে দেয় নি, যারা তার সঙ্গে ঝগড়া করে না, যারা তাকে টিউলিপে ফুল এনে দেবে একদিন না একদিন বলেছে, সে তাদেরই কেবল নৌকায় উঠতে দিয়েছিল। নৌকায় উঠে দেখলে মাছটার সবটা দেখা যায়। যদিও পাজি নচ্ছারটা কিছুতেই জলের ওপর ভেসে উঠছিল না, বেশ নিচে, একটা ভারি অন্ধকার মতো হয়ে আছে। সে লম্বা ছিপটা নিয়ে জলের নিচে খোঁচা মারতেই—একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো হাওয়ায় লাফিয়ে উঠেছিল—কি বড়, আর আলিসান! রূপোর মতো ঝকঝকে আঁশ, গোল গোল প্রকাণ্ড ঝিনুকের মতো শরীরে লেগে আছে। চোখ ছুটো রাঙ্গা কুকুরের মতো দেখতে।

বাপ ফিরে এসেছে। তায় এতবড় একটা সুরমাই মাছ ধরে এনেছে, সাবিনা অভিমান বেশিক্ষণ আর জিইয়ে রাখতে পারে নি। করমর্‌াঁত পাখিটাকে বগলে চেপে ঠোঁটে চুমু খেল। কালো ডাহুকের মতো ছোট্ট পাখিটা আদর খেয়ে লজ্জায় মুখ রাঙা করে ফেলেছিল। আবিন দাহু তখন পাড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে—আমি দেখব সাবিনা। নৌকায় আমাকে উঠতে দে।

আবিন দাহু সাবিনাকে খুশি রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সামসের এটা বোঝে। সে বলেছিল, এস না উঠে। উঠে এস দেখ।

এবং সামসের এই আবিন চাচাকে খুব সমীহ করে কথা বলে থাকে। কেবলমাত্র এই মানুষটাকেই মনে হয় দ্বীপে একমাত্র সাধু মানুষ। কোনো স্বার্থপরতা নেই। লিপ্সা নেই। সবাই এসেছে ভালোমানুষী দেখাতে। আসলে মাছটা যখন কাটা হবে, এবং কামারু দালাল মাছটার ভালো ভালো অংশ, যেমন—পেট এবং লেজ আর গর্দান সবটা এক দরে কিনবে—মাথার বেলায় এমন দর কষাকষি লাগাবে যে ইচ্ছেই হবে না সামসেরের আর বিক্রি করার। সে তখন বাধ্য হয়ে বলবে, ওটা থাক। এবং থাকলেই সামসেরের স্বজাতিরা বুঝবে, কিছু ভাগ বিনে পয়সায় প্রত্যেকের ঘরে ঘরে চলে যাবে। যে যত ভালোমানুষী বেশি দেখাবে তার ভাগে তত বেশি। কেবল আবিন চাচার সে-সব নেই। সে মাছ খায় না। তার প্রিয় খাদ্য মিষ্টি আলু সেদ্ধ আর গাধার দুধ। দুধে মিষ্টি আলু ফুটিয়ে একদিন রেখে দেয়, খায় তিনদিন। বুড়ো মানুষটার কোনো আর দায় নেই। সামসের না থাকলে সাবিনার সঙ্গে কুটিরে শুয়ে থাকে।

গাধা দু'টোকে নিয়ে মানগানু উপত্যকাতে উঠে যাবে। সাহেবরা এখনও উপত্যকাটার দিকে নজর দেয় নি। বে-ওয়ারিশ উপত্যকা। ছাগল-গরু, ভেড়া যে যার মতো চরাচ্ছে। মানগানু উপত্যকার নিচে কোনো খনিজ পদার্থ নেই। থাকলে আর বোধহয় বেশিদিন ওরা ওটাকে এভাবে ফেলে রাখত না। মানগানু কিছুটা ঢালু উপত্যকার

মতো। চারপাশে সব নারকেল গাছ এবং কিছু ইউকন গাছ। ফাঁকে ফাঁকে সব সাদা হলুদ পাথরের টিবি। ফাঁকে ফাঁকে মাটি এবং ঘাস। এই বড় দ্বীপটার মতো সৌখিন জায়গা সামসের জানে পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। টিলার ওপাশে খাদের মতো নেমে গেছে। আর একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে সেখানে। জল নেমে নিচে যেতে যেতে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এবং আরও নিচে নেমে যখন সমুদ্রে মিশে যায় তখন মাছেরা সব সেখানে বেড়াতে আসে।

আবিন চাচার মাঝে মাঝেই সখ হয় দ্বীপটাকে ঘুরে দেখার। সেই একমাত্র জানে, দ্বীপটার কোথায় কি আছে। মাইল পাঁচ-সাত লম্বায়, মাইল পাঁচ-ছয় প্রস্থে। একটা গোল ইউকন পাতার মতো দ্বীপটা জলে ভেসে আছে। পাশে দশ পনের বিশ কি আরও দূরে দূরে এমনি কত সব ছোট দ্বীপ। কোনোটায় দু'চারটে ইউকন গাছ, কোনোটাতে কিছু নেই। উপদ্রবের ভেতর কিছু কাঁকড়া বিছে। আর কোনো বিষাক্ত প্রাণী দ্বীপগুলোতে আছে বলে জানা নেই।

দ্বীপে আছে একটা গীর্জা। দ্বীপে আছে সমুদ্রের ধারে ধারে সাহেবদের কিছু বাংলো। তিনটি ক্রেন, পাঁচটা বুলডজার। আঠারোটা তামার পিপে। মাসে দু'মাসে একখানা করে জাহাজ আসে। জাহাজে মদ এবং পুরানো কাপড় জামা নিয়ে আসে নাবিকেরা। আর যারা দ্বীপটার মূল অধিকর্তা, তাদের লোক দশ-বিশ বছর বাদে এক-আধবার জরিপ করে চলে যায়।

সামসেরের কাজ পিপেতে ফসফেট ভর্তি করা। একবেলা কাজ করলে দু' শিলিং, দুবেলা কাজ করলে তিন শিলিং। সে সাধারণত একবেলাই কাজ করে। সে আর সাবিনা। সাবিনার মা লালী দু'সাল আগে কোনো এক উৎসবের দিনে মারা যায়। সেই থেকে তার টাকা পয়সার দিকে খুব কম মোহ। দু'জনের সংসারে কত লাগে! অন্য যারা, এই যেমন রাঁতিনা, রেঁবন, ব্যাবিলা—তাদের সংসারে লোকজন বেশি বলে দু'বেলাতেই খাটে। যে যার খুশিমতো কিছুটা

জায়গা নিয়ে করে নিয়েছে নিজ নিজ খামার। এবং চাষ আবাদ বলতে মিষ্টি আলুর ফলন খুব ভালো। ছ'টা ঘোড়ার ভেতর একটা বড় সাহেবের। দুটো ঘোড়া একটা গাড়ী টানে। পাকা রাস্তা বলতে কোয়ার্টার থেকে সমুদ্রের বালিয়াড়ি পর্যন্ত। ঐটুকু পথ সাহেব মানুষদের বাচ্চারা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আসে। এবং একটা ঘোড়া আবিন চাচার। সে অনেক সময় জাহাজ থেকে মাল বোঝাই করে ঘরে ঘরে রসদ পৌঁছে দেয়। এর বিনিময়ে মাস মাইনে সে পায় আঠারো শিলিং। ঘোড়ার ভাড়া এগার শিলিং, খাওয়ার খরচ তিন শিলিং, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাকি চার শিলিং বরাদ্দ।

ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আবিন চাচার কোনো খরচই নেই বলতে গেলে। সে প্রায় চার পাঁচ একর জমির ভেতর বাস করে। সবটাই প্রায় পাথুরে জমিন। ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু মাটি পাওয়া যায়, তার ভেতর একটা দুটো মিষ্টি আলুব লতা লাগিয়ে রাখে। এবং গোনা গুনতি একশ কুড়িটা এমন লতাগাছ আছে। একটা তুলে সেই গাছের লতা কিছুটা কেটে সেখানে পুঁতে রাখে আবিন চাচা। হিসাব মিলিয়ে তার কাজ। একটা লতায় তিনটে থেকে চারটে আলু, ওজন তিন-পোয়াটেক। সেই আলু দুধে সেদ্ধ করে তিন দিন। বছরে একশ কুড়িটা লতাই তার যথেষ্ট। গাধা দুটো ছ'মাস ধরে দুধ দেয়। বাচ্চা বড় হলে স্যামসন সাহেবের লোকেরা নিয়ে নেয়। দাম দেয় না। খাবার থাকবার এমন সুবন্দোবস্তের পর আবিন চাচারও বেশি কিছু দরকার হয় না।

সামসেরের কাছে এই মানুষটাই আদর্শ মানুষ। নৌকা টেনে চড়ায় তুলে ডেকেছিল, এবারে উঠে এস চাচা।

আবিন চাচা ছেলেমানুষের মতো লাফিয়ে উঠে গিয়েছিল নৌকায়। আর উঠতেই পিছলে নৌকাটা সড়াৎ করে জলে ভেসে গেছিল। সামসের জানে গেরাফি ফেলা আছে। বেশিদূর যেতে পারবে না। গোল তামার আংটায় মোটা সুতলিতে মাছটা গাঁথা। জলের ভেতর

এমন একটা আলিসান মাছ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে দেখে আবিন চাচার সাদা দাড়ি নড়ে উঠেছিল। বলেছিল, হিম্মত আছে বেটা। কবজা করতে পারলি !

হয়তো সবটাই বলতে পারত—কি কি কৌশল, কিভাবে খোঁট দিয়েছে, দিয়ে সাধু মানুষের মতো কতক্ষণ একেবারে ঠাণ্ডা, তারপর কতটা বেগে নৌকা নিয়ে গভীর সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়েছে সব—কিন্তু শরীর দিচ্ছিল না বলে সে সবার সঙ্গে উঠে গিয়েছিল। কামারু দালালকে খবর দিতে হবে। কেবল সেই পারে গোল মতো সাহেবদের সংরক্ষিত অঞ্চলে যেতে। ওর পাস আছে। সাহেবদের বড় প্রিয় মাছ। মাছটার দাম কম করেও সে পাবে সতেরো শিলিং। অনেক অনেক টাকা হয়ে যাবে এবার তার।

বুড়ো ঘোড়াটার কোনো আর কাজ নেই। সে এই দ্বীপটায় নিজের খুশিমতো ঘুরে বেড়ায়। যখন যেখানে খুশি শুয়ে থাকে। আর ছ'নম্বর ঘোড়াটা গাভীন। ওর বাচ্চা হবে সামনের মাসে। দ্বীপটায় আর আছে আটাশটা ছাগল, ছেচল্লিশটা ভেড়া, তেত্রিশটা গরু, দশটা মোষ। একটা গরু সামসেরের। ভালো দুধ দেয়। তিনটে ষাঁড় আছে। আর একটা ভালো জাতের ষাঁড় আগামী মরশুমে আসার কথা। মানগান্নু উপত্যকার ওপাশে উষ্ণ প্রস্রবণ পার হয়ে গেলে ইউকনের গভীর বন। লম্বা বড় বড় গাছ। মাথায় গোলমতো পাতা। গাছ কেটে থাম, খামারে সবুজ সব চাষ-আবাদের ভূমিতে যত কুটির সব ঐ গাছের থামে। অধিকাংশ কাঠের সুন্দর লাল নীল রঙের বাড়ি। স্যামসন সাহেবের বাংলোতে দু'সাল আগে টিউলিপ ফুলের চাষ হয়েছে। ফুলের আশ্চর্য পাপড়িগুলো কখনও বাতাসে উড়ে আসে, নরম মখমলের মতো, এবং সাদা শংখি ফুলের মালার ভেতর লকেটের মতো একটা পাপড়ি গেঁথে দিলে বড় সুন্দর লাগে মালাটা। সাবিনা যখন মনঃকষ্টে ভোগে তখন একটা মালা নিয়ে আসে আবিন চাচা। মালাটা পরিয়ে দেয় গলায়। বলে, রাজা থাকলে সাবিনা তোকে ঠিক

রাণী করে নিত। বলে বুড়ো হা হা করে হাসে। তুই আমার বউ হবি? রোজ তোকে দুধে মিষ্টি আলু সেদ্ধ করে খাওয়াব।

—মারব বুড়ো।

সামসের বললে, আহা বুড়ো মানুষটার কেউ নেই। তোকে যখন খুবই পছন্দ—

—বাবা ভালো হবে না।

—আমিও বাঁচি। সামসের দা দিয়ে তালের শাঁস কেটে সাজিয়ে রাখে তখন ঝুড়িতে।

কিছু তালগাছও আছে। কলা গাছ, লেবুর ঝোপ তৈরি করেছে খামারের ঢালু অংশটাতে। একটা বড় আমলকি গাছ আছে তার খামারে। সামসেরের বাবা একবার ফিজিতে বড় দিনের উৎসবে সঙ সাজতে বায়না নিয়ে চলে গিয়েছিল, ফেরার সময় সে প্রায় কিছুই আনে নি, উপার্জনের সবটা দিয়ে এনেছিল আখের চারা, আমলকির বীজ, শিমের বিচি, দুটো আমের আঁটি। আমের আঁটি দুটো শেষ পর্যন্ত বাঁচে নি। আখের বংশধর এখনও কোনরকমে টিকে আছে— এই পর্যন্ত। ভালো মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। পেলে একবার দেখা যেত—কি করা যায়।

দ্বীপটায় এ-জন্য একটা ছাগল বাচ্চা দিলেও খবর হয়ে যায়। তিরপিতির সাদা ছাগলটা তিনটে বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চারা দৌড়ে যায়। এবং ছাগল ছানাগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে নাহারু গান গায়। এবং ওরা পাতার মুকুট পরে নাচে। আর তখন থাকে চারপাশে সমুদ্র। উত্তাল তরঙ্গমালা। দ্বীপটার পশ্চিম দিকে খাড়া পাথরের দেয়াল ঘেঁষে সব সামুদ্রিক মাছেরা লেজ নাড়িয়ে শ্যাওলা খায় তখন।

॥ দুই ॥

সামসের রাতে ভালো ঘুমোতে পারে নি। মেয়েটা খুব জ্বালিয়েছে। কি যে হয় মাঝে মাঝে। মার কথা মনে হলেই মেয়েটা রাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সে এখনও বলতেই পারে নি, তার মা বেঁচে নেই, মরে গেছে। তা ছাড়া দ্বীপে মৃত্যু কথাটা কেউ উচ্চারণই করে না। দূরে ঐ যে একটা ছোট দ্বীপ আছে, পিন্‌চি পাহাড়টার নিচে, সেখানে সাবিনার মায়ের সমাধি। সব ছোট ছোট দ্বীপের ভেতর, ঐ দ্বীপটাই মনে হয়েছিল সামসেরের মানুষের মলমূত্রে অপবিত্র হয় নি। বিশ বাইশ একরের মতো এক নীল ভূখণ্ড। পালে হাওয়া লাগলে আট ন'ঘণ্টার বেশি লাগে না। সাবিনা বড় হলে সে ভেবেছে ওখানে চলে যাবে। আবিন চাচা, তিরপিতির, ছুতোর কাদরি, আর সে মিলে কফিনটা যখন নৌকায় তুলে নিয়েছিল, সাবিনা চিৎকার-চেঁচামেচি করেছে, মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!

আবিন চাচা বলেছিল, কুটুম বাড়ি যাচ্ছি।

সামসের অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। তিরপিতির পাল খাটাচ্ছে। দ্বীপের সব মানুষেরা পাড়ে দাঁড়িয়ে। বান্‌চি নাপিত সাবিনার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। বছরে দু'বছরে একবার সবাইকে এ জায়গাটায় আসতে হয়। দ্বীপবাসীরা কাউকে না কাউকে কুটুম বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মৃত্যু বলে কিছু নেই এখানে। সবাই শেষ পর্যন্ত কুটুম বাড়ি যায়।

সাবিনার বয়স তেমন না। ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে সে তার খুশিমতো চলে যায় মানগাম্নু উপত্যকাতে। উপত্যকার ঢাল বেয়ে ওপাশে সেই উষ্ণ প্রস্রবণ। লাল নীল সব পাথর, তারপর কত রকমের বন্য গাছ, বন্য ফুল, ইউকনের ছায়া, নিচে নেমে গেলেই হাত

দিয়ে বুঝতে পারে প্রস্রবণের জল ভারি ঠাণ্ডা। জল সমুদ্রে এখন প্রপাতের মতো পড়ছে। করমর্ঁাত পাখিটা তার বগলে। গলায় সুতলি বাঁধা। যে কটা মাছ দরকার অনায়াসে জলের নিচ থেকে তুলে আনতে পারে পাখিটা। লম্বা সুতলি ধরে রাখে সাবিনা। পাখিটা জলে ডুবে যায়। পাখিটাকে ক্ষুধার্ত করে রাখে সাবিনা। সে জলের নিচে ডুবে যায়। এবং দ্রুতবেগে ঝাঁক থেকে ঠিক ধারালো ঠোঁটে তুলে আনে রূপোলি মাছ। গলায় আংটা পরানো থাকে বলে গিলতে পারে না। সাবিনার পায়ের কাছে ফেলে দেয়। এবং যে কটা দরকার নিয়ে তারপর গলার আংটা খুলে দেয় সাবিনা। মাছ খাওয়ায়। এবং মাঝে মাঝে দূরে সেই দ্বীপটা বিন্দুর মতো ভেসে উঠলেই ওর মন খারাপ হয়ে যায়। সে তখন ফিরে এসেই বাপকে বলে, মার কাছে যাব। কুটুম বাড়ি যাব। আমাকে তুমি নিয়ে চল বাবা।

সামসের রাতে একেবারেই ঘুমোতে পারে নি। প্রথমে মাছটার জন্য চিন্তা হয়েছে। কামারু যা হিংসুটে লোক, কারো প্রসন্ন জীবন সে সহ্য করতে পারে না। সুখ সহ্য করতে পারে না। একটা বেড়াল পুষেছিল কামারু। এখন বেড়ালটার আটগণ্ডা পুষ্যি। এবং সামসেরের এটাই ভয়, যেভাবে বেড়ালের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছে—দ্বীপটায় একদিন হয়তো দেখা যাবে মানুষের চেয়ে বেড়াল বেশি। হিংসুটে বেড়ালগুলোর জন্য সে একটা বড় চালাঘর বানিয়ে দিয়েছে। ওর বৌ স্যামসন সাহেবের খাদে কাজ করে, ওটা ওর পছন্দ নয়। বারবার বারণ করেছে, নিষেধ করেছে, সে কামারু দালাল, ইজ্জত তার সায়েব-সুবোদের পরেই। কিছুতেই যখন কিছু হল না, ভেবেছিল বড়ই বিপাকে পড়ে গেছে, তখন বৌ একরাতে তার স্বপ্ন দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। বলেছিল, বেড়াল! বেড়াল শব্দটা কি! সে দ্বীপের সবাইকে বলেছে, বেড়াল মানে কি? সে আবার কেমন দেখতে! কেউ যখন বলতে পারে নি, খুবই ভিনদেশী ব্যাপার,

তখন কানে বিড়ি গুঁজে সোজা স্ট্যামসন সাহেবের বাংলোয় হাজির। ওর স্টুয়ার্ড নিমকি খুব সুন্দর মতো কথা বলে। হাসে। সে তাকেই বলেছিল, নিমকি, তুমি বেড়াল বলে কিছু জানো!

—বেড়াল মানে বেড়াল!

—বেড়াল! সে আবার কি!

—বেড়াল ছ্যাখোনি। আচ্ছা এস। ছবি দেখাচ্ছি। নিমকি একটা বই এনে বলেছিল, এই হচ্ছে ক্যাট। বাঘের মাসি। এই হচ্ছে ক্যাটের ছানা পোনা। বাঘের লিলিপুট অবস্থা হলে যা হয়। তাহলে স্ট্যামসন সাহেবের অন্দরেও গিয়েছিল হারামজাদি। আর ঠিক এই ক্যাটের ছবি দেখে ভিরমি গেছে। সে বলেছিল, নিমকি, কোথায় পাওয়া যায় ক্যাট!

—ইস্তাম্বুলে।

—কোথায় সেটা?

—হেলসিংকির নাকের ডগায়।

—তা হেলসিংকির নাকের ডগায় তো বুঝলাম। কিন্তু নাকের ডগায় বিষফোঁড়া আমার নিমকি। একটা ক্যাট এনে দিতে পার আমাকে? জাহাজে যখন মালপত্র আসে তার সঙ্গে একটা ক্যাট আনিয়ে দিতে পার না!

নিমকি বলেছিল, খুব সোজা। স্ট্যামসন সায়েবের যে লিস্টি যাবে তাতে একটা ক্যাটের কথা লিখে দেব।

আর তারপরই হাজির কালো কিম্ভূতকিমাকার ক্যাট। তাও আবার গাভীন ক্যাট। কামারু বাদ্য বাজিয়ে সারা দ্বীপ ঘুরেছিল, ক্যাটের গলায় দড়ি বেঁধে। জ্যান্ত ক্যাট দেখে ওর হারামজাদি ভিরমি গিয়েছে আটবার। ন'বারের বার বলেছিল কামারু, বল খাদে আর যাবি না। বল, আমার কথা শুনবি?

চোখ বুজেই বলেছিল, দোহাই রে কামারু। তোর চৌদ্দগুষ্ঠির নামে কিরা কাটলাম, আর যাবনি। আর যাবনি রে মুখপোড়া!

কামারু তখন যেমন বাদ্য বাজিয়ে সারা দ্বীপ ঘুরেছিল, তেমনি ওটাকে কুটুমবাড়ি পাঠাবার আগেও একবার আবার বাদ্যি বাজিয়ে সারা দ্বীপে ঘুরেছিল। তারপর মানগাম্নু উপত্যকা পার হয়ে, ইউকন গাছের বন পেরিয়ে সাদা পাথরের পাঁচিলের ওপর উঠে বিসর্জন দিয়ে দিল বাঘের মাসিকে। ঘরে ফিরে দেখেছিল হারামজাদি সুস্থ হয়ে উঠেছে। বলেছে, দিয়ে এলি ?

—দিয়ে এলাম কুটুমবাড়ি।

—নিশ্চিন্তি।

আর রাতেই—ম্যাও। কামারুর বৌ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল, ম্যাও শব্দে চমকে গেল। সে বলল, কামারু রে আবার এইল।

কামারু লণ্ঠন জ্বালিয়ে পেছনের বাগানে ঢুকেই অবাক। মুরগির ঘরের নিচে খড়কুটোয় সাতটা বাচ্চার জননী ক্যাট দিব্যি থাবা চাটছে। জলে ডুবে কুটুমবাড়ি তবে দেখা হয় নি !

বাঁজা মেয়েছেলে ঘরে। সে গিয়ে বলল, আয় দেখবি। কেমন মায়া পড়ে গেছে কামারুর।

—আয় না দেখবি, কি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা।

কামারুর বৌ গামছা পরেছিল। সে হামাগুড়ি দিয়ে দেখল, সাতটা লাল নীল সবুজ হলুদ কালো সাদা রঙের বেড়াল ছানা। ভেতরে ভীষণ পুলক জেগে গেল তার। ঘর এবার আলো হয়ে উঠবে। সে বলল, কামড়াবে না তো ?

—কামড়ায় না। গ্যাখ না।

কামারু হাত বাড়াল।

ক্যাট তখন ভীষণ সাধু হয়ে গেছে। বিনয়ী। চোখ দুটো ভারী দুঃখী দেখাচ্ছে। ওরা দুজনে বসে তখন কি করে, দ্বীপে ছাগল ছানা হলে, গরু বাচ্চা দিলে যেমন শিশুরা গান গায়, নাহারু গান, ওরা তেমনি শিশু হয়ে গিয়ে গলায় নাহারু গান ধরে দিয়েছিল। আর সেই থেকে ক্রমে আটগণ্ডা বেড়াল ছানা, এবারেও নাকি তিনটা

গাভীন। যা দিন দিন হচ্ছে সামসেরের মনে হল, আস্ত একটা সুরমাই কামারুর বেড়ালের ভোজে বছর দুবছরের ভেতরই দরকার হয়ে পড়বে।

আগে কামারু খুব বিবেচক মানুষ ছিল। সে শুধু মাছের প্রয়োজনীয় অংশটুকুই নিত। নাড়িভুড়ি নিত না, মাথা নিত না। যেহেতু বেড়ালের পোষ্য বাড়ছে, সে এখন গোটা মাছটাই দাবী করে বসে থাকে। এবং কামারু একজনই দালাল, সে যদি সকাল সকাল গোসা করে না আসে সেধে নিয়ে আসতে হবে। এবং যেহেতু দাম দর করার রেয়াজ নেই, একজনই দালাল, আর সামসের একজনই মাছের কারবারী—তখন কিছুটা কামারুর মর্জিমাফিক চলতেই হয়। স্বার্থপর লোভী কামারুর কাছে হাতজোড় করে না রাখলে সবটাই হয়তো তুলে নেবে।

সামসেরের লোভ মাথাটায়। কারণ এতবড় মাছটার মাথাই হবে আধমণের মতো। ওর ঘিলু দিয়ে পুঁদিনা পাতার বড়া! ওর স্বজাতিরা সেই কবে থেকে বলে আসছে—সামসের তোর বাবার মতো একবার পুঁদিনা পাতার ঘিলুর বড়া খাওয়া তো। সে সুরমাই মাছের খোঁজে চার পাঁচ সাল থেকেই মাঝে মাঝে গভীর সমুদ্রে চলে গেছে। মাছ উঠেছে, বড় মাছও লেগেছে, কিন্তু একটাও বড় সুরমাই মাছ সে পায় নি। পেলেও খুবই ছোট জাতের। পাতে দিলে মস্করা করা হবে।

সারারাতই সে প্রায় জেগেছিল। প্রথমে মেয়েটার সেই কুটুমবাড়ি যাওয়া নিয়ে কান্না, তারপর ঘুমিয়ে পড়লে, কামারুর দুষ্টুবুদ্ধির সঙ্গে কি কি যুক্তিতর্ক খাড়া করে লড়বে ভাবতে ভাবতেই মনে হল, তিরপিতির মুরগীগুলো ডাকছে।

সাবিনা ঘুম থেকে উঠে দেখল বাপ বিছানায় নেই। ঠিক খাঁড়িতে তবে নেমে গেছে। বেলা বাড়লে কামারু চাচা যাবে। তার আগে বাপ মাছটাকে তুলে ফেলবে ডাঙ্গায়। একা পারবে না। সঙ্গে দু একজন থাকবে। ওরা তার বাপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবে।

যা একখানা মাছ করজা করেছে সামসের। কেউ আর ঘরে থাকবে না। এবং সাবিনা জানে, বাপ আজকের জন্য দ্বীপে ভারি মান্য-গণ্য মানুষ।

আবিন চাচা যাচ্ছে মানগান্নু উপত্যকায়। দুটো গাধা, দুটো ঘোড়া আর সে নিজে। মাথায় লম্বা জোকারের টুপি পরেছে। আলখেল্লার মতো তালিমারা পোশাক। পায়ে ঘাসের চটি। ঘোড়া দুটোর সামনের দু'পা বাঁধা। লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। ব্যাবিলার ছোট ছেলে হরদুস ছাগলের ছানাপোনা নিয়ে যাচ্ছে মানগান্নুতে। ছাগলগুলো এখানে সেখানে মুখ দিচ্ছে। তিরপিতির দ্বিতীয় পক্ষের বৌ ঝটকা মেরে সোজা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালাগাল করছে হরদুসের বাপ ব্যাবিলাকে। ব্যাবিলার সাত পুরুষ উদ্ধার করছে। শাকপাতা খেয়েছে কি খায়নি বৌটার মাথা গরম হয়ে গেছে।

আর সবই সে তার টিলার মতো উঁচু জায়গাটায় বসে দেখতে পায়। হাতে মুখে জল দিয়ে একটু চা করবে। ঘাস পাতা শুকনো ক'রে পাশের চালাঘরে গরুটা বের করতে হবে। গোবরগুলো রোদে শুকোতে দিতে হবে। বাপের জন্য রান্না চড়াতে হবে—কত কাজ। ওর ইচ্ছে হয়েছিল একবার নেমে গিয়ে বাপের মাছ তোলা, কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কাটা দেখবে এবং আলাদা আলাদা ভাগ যখন কামারু চাচা তুলে নেবে ঝুড়িতে তখন পেটির কিছুটা সে ভালোবেসে চেয়ে নেবে। কামারু চাচা তাকে দেখলেই আজকাল খুব সদয় হয়ে যায়। বাপের কথা রাখতে চায় না। সে বললে কেমন খুব বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে বলে, তুই যখন বলছিস—তখন!

এবং কামারু চাচাকেও সে দেখতে পেল খাঁড়ির দিকে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে মিছিলের মতো যাচ্ছে লোকজন আর আটগণ্ডা বেড়াল। বেড়ালগুলো সামনের একটা মরা কাঠের গুঁড়িতে গিয়ে বসে পড়বে। ভোজের আগে গাছতলায় জিরিয়ে নেওয়ার মতো। কামারু চাচার খুব বাধ্যের। যতক্ষণ না কামারু চাচা বলবে, ঠায় বসে থাকবে

ধার্মিক মহাজনের মতো। যেন কিছু জানে না। বোঝে না কিছু। মাঝে মাঝে ম্যাও ম্যাও করে নালিশ জানাবে চাচাকে। আর কতক্ষণ বসে থাকব হে বাপু, পেট জ্বলছে। আঁশ, পেটের নাড়ি-ভুড়ি, রক্ত-মাংস যা কিছু পাতায় লেগে থাকবে চেটে পুটে খাবে তারা।

মাথা বোঝাই করে ইউকনের বড় বড় পাতা নিয়ে যাচ্ছে তিরপিতির। পাতাগুলো বিছিয়ে তার ওপর রাখা হবে মাছটাকে। ঘোড়ায় চড়ে কেউ উঠে আসছে দূরে। বোধ হয় স্যামসন সাহেব নিজে। খবর সেখানেও পৌঁছে গেছে। কেবল সাবিনাই তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না। হাতে কত কাজ। দু'দিন বাপ না ফেরায় সে হতভম্ব হয়ে গেছিল। ফিরে আসায় তার কাজ বেড়ে গেছে। তবু ছলছুতো করে সে ভেবেছিল খাঁড়িতে একবার নেমে যাবে। যাবার আগে মোরগের ঘর থেকে মোরগগুলো বের করে দিল। জোরে জোরে ডাকল, আবিন দাদু, গরুটা দ্যাখো যাচ্ছে। এবং আবিন দাদুর কি যে আছে তার জানা নেই, দাদু হাত তুলে দিলেই গরুটা লেজ উঁচিয়ে ছুটতে থাকে। গরুটা আবিন চাচার জিম্মায় দিতে পেরে কিছুটা সে হাল্কা হয়ে গেল। মানগান্নুতে তাকে আর যেতে হচ্ছে না। চা সে মাটির হাড়িতে একটু বেশি করেই ফোটাল। মাটির পাত্রে চা নিয়ে সে নেমে যেতে থাকল খাঁড়িতে। বাপ আর কিছু বলতে পারবে না। চা করে নিয়ে এসেছে মেয়েটা।

সে করমর্‌াত পাখিটাকে ফের বগলে নিয়েছে। চিরুণী দিয়েছে মাথায়। ফুলের পাপড়ি গুঁড়ো করে রাখে। সেই গুঁড়ো মুখে মেখে নিয়েছে কিছুটা। সে খুব সেজেগুজে নেমে যেতে থাকল। স্যামসন সাহেবের ঘোড়াটা আর দেখা যাচ্ছে না। দূরে বনের ভেতরে হারিয়ে গেছে। বনটা পার হলেই খাঁড়ির মুখ। ইউকন কাঠের একটা মজবুত সাঁকো আছে। দু'লাফে ঘোড়াটা সাঁকো পার হয়ে আসবে।

স্যামসন সাহেবকে সবাই যমের মতো ভয় পায়। সেই সাহেব

আসছে বাপের ধরা মাছটা দেখতে। কি হবে কে জানে? সাহেব-সুবো লোক দেখলেই তিরপিতির দ্বিতীয় পক্ষের বৌটি এত যে গোল-মেলে, সেও স্থির থাকতে পারে না। গালমন্দ মাথায় ওঠে। কেবল দৌড়ায় আর পেছন ফিরে তাকায়। সেই স্যামসন সাহেব যখন মাছটা দেখে খুব খুশি মুখে ডাকবে জন সামসের, তখন বাপ না জানি কি করবে!

পুঁদিনা পাতার বড়া হবে বলে সে কিছু পুঁদিনা শাক তুলে রেখেছিল। রাঁতিনাদের বাড়ি যাবে ভেবেছে। ওদের সাতটা আদা গাছ আছে। একটু আদা চাইলে আজ ঠিক দেবে। এত সবের পর যদি মাছটা সাহেবের খুব পছন্দ হয়ে যায়, এবং সাহেব তো ঠিক তাদের মতো খাওয়া-দাওয়া রপ্ত করেছে, এবং উৎসবের মতো যদি কিছু ওদের শহরে করেই ফেলে তবে আর ওর আঁশটুকু পাবে না। সে বলল, যীশু, স্যামসন সাহেবের মর্জি ভালো করে দাও। বাপ কামাই করেছে বলে গালমন্দ যেন না করে। যীশু তুমি তো সব জান, সব দুঃখ বোঝ, আমার মাকে বলে দাওনা আর কুটুমবাড়ি যেন না থাকে। চলে আসতে বলে দাও। এত বড় মাছ দেখে মা আমার কিই না খুশি হত!

সাবিনা খুব সন্তর্পণে হাঁটছিল। খাঁড়ির মুখটা খুব ঢালু। হাতে মাটির পাত্রে চা। একটুকুতেই চলকে পড়ছে। সে একেবারে নিচে নেমে খাড়া দেওয়ালের পাশ দিয়ে কিছুটা হেঁটে গেল। এবং একটা জোয়ান ইউকন গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে বুঝল মাছটা জল থেকে তোলাই হয় নি। কিছু একটা তবে হয়েছে! সে খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। মানুষজন সব দাঁড়িয়ে। কামারুর বেড়ালগুলো বিজ্ঞজনের মতো মরাকাঠের একটা গুঁড়িতে বসে। বাপ, তিরপিতির, রাঁতিনা এবং বাতিঘরের রোগা লোকটা গোল হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে। চা দেখে ওরা চারজনই লাফিয়ে উঠেছে। সে ভাঁড়ে ঢেলে ঢেলে দিল। বলল, বাপ, মাছটার কি হল?

—সাব আসুক। সাহেব না এলে কামারু দাম-দর করবে না বলছে।

সাব মানে স্যামসন সাহেব। সে এসে দেখবে। সে না এলে তুলতে পারছে না। সাবিনা দেখছে বনের গভীরে ঘোড়াটা ঢুকে গেছে। পথটা বেঁকে গেছে অনেকটা। ঘুরে আসতে হয় খুব। সবাই বসে আছে। স্যামসন সাহেব না আসা পর্যন্ত মাছটা তোলা যাচ্ছে না।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পাহাড়ের মাথায় পাথর ভেঙে ঘোড়োটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। স্যামসন সাহেবের একরকমের পোশাক। সাদা হাফ-প্যাণ্ট, সার্ট। পিঠে বন্দুক সব সময়। এবং এসে ঘোড়া থেকে নামলে সবাই সেলাম জানাল। তিনি উঠে গেলেন নৌকায়। মাছটা দেখে গোঁফে তা দিলেন। সোনালী গোঁফজোড়া বেশ চওড়া হয়ে গেল খানিকটা। তিনি খুশি হয়ে ছুটো গিনি বকশিস দিলেন সামসেরকে। সামসেরের গর্বে মুখ ভরে উঠেছিল। তখন কিনা সাবিনাকে দেখে সাব বলল, সামসের, ইওর ডটার?

সে বলল, আজ্ঞে হুজুর।

—ভেরি বিউটিফুল।

এটা সাবের ভালো কথা না। সে ঘাবড়ে গেল। বলল, সাব, ঠিক বিউটিফুল না। কিছু বিউটিফুল।

—নো নো ভেরি বিউটিফুল।

সাবিনা কিছুই বুঝতে পারে না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল। বাপের মুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। সে দেখল বাপ আর কোনো কাজে উৎসাহ পাচ্ছে না। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, বাবা, সাহেব তোমাকে কি বলেছে?

সামসের শুধু তিরপিতিরকে বলল, তোমরা হাত লাগাও। স্যামসন যেমন এসেছিল বেগে, তেমনি বেগে চলে গেল। স্বজাতিরা মিলে

যেখানটায় তারা বাস করে, স্যামসন সেখানে বড় একটা আসে না। মানুষটার সব গুণই আছে। জেদি, একগুঁয়ে, স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচারী, এইটুকুতেই ইনাম দিতে পারে, একটুকুতেই চাবুক মারতে পারে। সুন্দরী বৌরা কাছে পিঠে থাকতে চায় না। ঘোড়ার শব্দ শুনলেই, যে যার সুন্দরী মেয়ে-বৌদের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখে। ঘোড়ার শব্দ মিলিয়ে গেলে ওরা বন থেকে বের হয়ে আসে। কামারু দালাল অবশ্য খোঁজখবর রাখে সব। তাই বলে ঐটুকু মেয়ে সাবিনা, সামসের কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে।

কামারু বলল, তোর কপাল খুলে গেলরে সামসের।

মাছটা তখন তোলা হচ্ছে। খুলিতে দড়ি পাকিয়ে তোলা হচ্ছে। সমুদ্রের জল-বালি উথাল-পাতাল হচ্ছে। টেনে আনতে পারছে না। যেন একটা ভারি পাথর টেনে আনা হচ্ছে। মাথাটা কোনো রকমে জলে ভেসে উঠতেই সাবিনার কষ্ট হতে থাকল। এত বড় জীব, বাপ না ধরলেই পারত, স্যামসন সাহেব চলে যাবার পর বাপের মুখ দেখে সে কেমন খুব দুঃখী হয়ে গেল। মাছটা তখন বালিয়াড়িতে লাফাচ্ছে। লেজ নাড়ছে। বেড়ালগুলো সারি সারি বিজ্ঞজনের মতো তখনও বসে আছে। কামারু চাচা আবার একটা বিড়ি ধরাল। তারপর মাছের দুটো আঁশ নিয়ে দুটো বেড়ালকে দিল, তারপর তিনটে আঁশ, তারপর অনেকগুলো আঁশ। মাছটার আঁশ তুলে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পাতাগুলো। বড় বড় ঝুড়িতে তুলে নিচ্ছে কামারুর লোকেরা। সাবিনার হাত ধরে সামসের উঠে যাচ্ছে। সে কিছুই দেখছে না। এমন একটা ছোট্ট মা মরা মেয়ে! এখন থেকে কামারুকে দিয়ে খোঁজখবর সব রাখবে। সে গিনি দুটো হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। খাঁড়ির জলে পড়ে টুপ করে ডুবে গেল। দ্বীপটিতে সামসের আর নিরাপদে থাকতে পারবে না বুঝতে পারছে। সাহেবের খাদে জোরজার করে একদিন না একদিন তুলে নিয়ে যাবে সাবিনাকে।

॥ তিন ॥

বিকেলে সে আবিন চাচার খোঁজে গেল। সাঁঝ লাগলেই আবিন চাচা ফিরবে—ত্বপুর পর্যন্ত চুপচাপ শুয়েছিল, তারপর ভেতরে এত ত্বশ্চিন্তা দেখা দিল যে শুয়ে থাকতে আর পারল না। মানগান্নুতে আবিন চাচা গাধা ত্বটোকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। সে মানগান্নুতে উঠে ডাকল, চাচা।

উপত্যকাটা খুবই বড়! অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। পশ্চিমের খাড়া পাথরের দেয়াল, পূবে ঢালু উপত্যকা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এবং সমুদ্রের নীল জল আর সবুজ এই ঘাসের প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে এখন আবিন চাচা। একটা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে সমুদ্র দেখছে।

দিগন্তে আকাশ-সমুদ্র মেশামেশি। কতটুকু আকাশ কতটুকু সমুদ্র বোঝা যায় না। কেবল বাতিঘরের গম্বুজ দেখে বোঝা যায় সমুদ্র আর আকাশ ওখানটাতেই ভাগ হয়ে গেছে। সাদা বালিয়াড়ি মানগান্নুকে রূপালি রেখার মতো অথবা হাঁসুলির মতো ঘিরে রেখেছে। মানগান্নু উপত্যকার কাছে সমুদ্রকে ভিড়তে দিচ্ছে না। যা লোভ, বড় বড় ঢেউ তুলে উপত্যকার ভালোবাসা পাবার জন্য কেবল ত্বহাত ওপরে তুলে যেন ছুটে আসছে। এলে কি হবে, বালিয়াড়ি থাবা দিয়ে সব ওস্তাদী থামিয়ে দেয়। ঢেউ আছড়ে পড়ে। অথবা দেখলে মনে হয় কতকাল থেকে মাথা কুটে মরছে মানগান্নু উপত্যকার ওপরে উঠে যাবার জন্য। একটা চরম যুদ্ধ সেখানে লেগেই আছে যেন। সামসের দূরের সেই সমুদ্র এবং আকাশ আর বালিয়াড়ি দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভারি অন্যমনস্ক সে। ঘাস পাথর, কখও সব শংখি ফুলের ঝোপ পার হয়ে চলে যাচ্ছে। আবিন চাচার ত্বটো গাধা,

ঘুটো ঘোড়া, ওর গরুটা এবং স্বজাতিদের কিছু ছাগল ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে উপত্যকাতে। সব দূরে দূরে বিন্দুর মতো দেখা যায়। আশ্চর্য এক শান্ত নির্জনতা রয়েছে এখানে। বৌটাকে সমাধি দেবার পর সে ক'দিন রোজ বিকেলে এখানে চলে আসত। এবং যেখানে আবিন চাচা একজন প্রহরীর মতো লাঠি হাতে বসে আছে, ঠিক সেখানটায় সে চুপচাপ বসে থাকত। সাঁঝ লেগে যেত কোনোদিন। সাবিনা ঢালু বেয়ে উঠে এসে ডাকত, বা···বা!

অনেকদূর থেকে সেই ডাক, সারা দ্বীপে যেন প্রতিধ্বনি তুলত, বা···বা। অনেক দূরে ছোট একটা নক্ষত্রের মতো বিন্দুবৎ অস্পষ্ট মেয়েটা, আর কতদূরে মিরাপাসে তার মা শুয়ে আছে—এবং দৃশ্যটা মনে হলেই সে কেমন টের পায়, বৌটা যেন হাতজোড় করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। প্রার্থনা করছে যীশু রাজার কাছে—মেয়েটা, মানুষটাকে সুখে রেখ রাজা। স্যামসন তো কখনও কাচ্চাবাচ্চার দিকে নজর দিত না। লালীকে স্যামসন দেখে নি। কামারুকে সে বলে দিয়েছিল, দালালী করবে না, একদম করবে না। তুমি তো আমাকে জানো। সামসেরের প্রবল শরীর এবং চওড়া কাঁধকে কামারু ভীষণ ভয় পায়। কিন্তু এখন তো সে আর কামারুকে দোষ দিতে পারবে না। স্বচক্ষে দেখে গেছে। কামারুর সাধ্য কি খবরাখবর না পৌঁছে দিয়ে দ্বীপে দিব্যি টিকে থাকে!

আবিন চাচা বলল, সামসের তুই!

সামসের পায়ের কাছে বসে সবই বলল।

আবিন চাচাকে খুব চিন্তিত দেখাল। বলল, তুই সামসের দ্বীপ ছেড়ে চলে যা।

—কোথায় যাব?

সত্যি কোথায় যাবে! সে এই দ্বীপ এবং সমুদ্র, পিনচি পাহাড়, মানগামু উপত্যকা, চাচার একশ কুড়িটা মিষ্টি আলুর গাছ, তিনটে ক্রেন, আঠারোটা পিপে, শতেক স্বজাতি, একটা আমলকি গাছ,

ইউকনের গভীর বন, উষ্ণ প্রস্রবণ, এবং কামারুর আটগণ্ডা বেড়াল বাদে কিছুই প্রায় দেখে নি, শোনে নি। কিভাবে খাবে, বাঁচবে সে, জানে না। সে খুব অসহায় মুখে তাকিয়ে থাকলে আবিন চাচা বলল, বুঝি, বললেই নয় না। এই ধর আমাকে যদি কেউ বলে, চল বুড়ো তোকে রাজা বানাবো আমরা, সত্যি কি আমি যেতে পারি! কোথায় আর পাব এমম সুন্দর একটা উপত্যকা। কোথায় দেখতে পাব এমন সুন্দর আকাশ সমুদ্র। কোথায় আছে আর নিরিবিলি এমন একটা ইউকনের বন। বললেই তো হয় না!

এবং দ্বীপের মানুষদের এই একটা বিড়ম্বনা শুধু। দ্বীপের ইজারা স্যামসন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। খাদে ওদের রক্ষিতারা কাজ করে। এক একজন এভাবে রক্ষিতা রেখেছে পাঁচ সাতজন করে। আবিন চাচার মেয়েদের খাদে গেলে দেখা যাবে। এদিকে আর আসার নিয়ম থাকে না তাদের। যারা খাদে ভারি কাজ করতে যায়, তারা আগে এসে খবর দিত, সুখেই আছে মাচিন। প্যাংকো সাব বেশ ভালোই রেখেছে তোমার আদুরে মাচিনকে। শেষে একদিন তেমন আর খোঁজখবর নিতেও ওর ভালো লাগত না। মাচিন ওকে ভুলেই গেছে। তবু মাচিন যখন যায়, তখন সে ছিল তিরপিতির যমজ ভাই-এর বৌ। যমজ ভাইটা খাদেই পড়ে থাকে। এদিকে আর আসেই না। প্যাংকো সাহেব খুবই উদার ধর্মভীরু মানুষ। যমজ ভাইটাকেও সুখে রেখেছে আবিন চাচা এমন বুঝতে পারে।

আবিন চাচা বলল, মুষড়ে পড়বি না। যীশুরাজই সহায়।

যীশু রাজার নামে জন সামসের সাহসী হয়ে ওঠে। আর তখনই দেখতে পায় দূরে একটা ছোট্ট মতো ভেলা। এবং সে বুঝতে পারে মাঝে মাঝে যে জাহাজটা এখানে নোঙর ফেলে, থাকে কিছুদিন, তারপর মাল বোঝাই করে চলে যায়, সেই জাহাজটা আবার আবার আসছে। এক একটা জাহাজ দু'বছর তিন বছর এভাবে এ-দ্বীপে মাল বওয়ার কাজ করে থাকে। দ্বীপের কাছাকাছি এলে সে বুঝতে পারছিল,

জাহাজটার রং আলাদা। অন্য কোম্পানীর জাহাজ হবে বোধ হয় এটা।

দেখা গেল সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দু'জন দ্বীপের মানুষ তাদের গরু-গাধাগুলো নিয়ে আস্তানায় ফিরছে। ওরা যেহেতু নিজেদের মনে করে থাকে ভারতবর্ষের মানুষ, যেহেতু ওদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল ফিজি থেকে, এবং ফিজি দেশটা ভারতবর্ষের মতোই আর একটা মহান দেশ—কত রকমের চিন্তা-ভাবনা দু'জনের, কেবল খুব চেষ্টা করলে ওরা সেই ফিজি দেশটায় যেতে পারে। তাও সোজা না, দ্বীপ ছেড়ে যেতে হলে সেই সাহেব মানুষগুলোর কাছে পাশপোর্ট নিতে হয়। দ্বীপ থেকে পালিয়ে যাওয়াটাও খুব একটা সহজ নয়।

নানারকম চিন্তা-ভাবনায় জন সামসেরের মন আদৌ ভালো ছিল না। সে গোয়ালে গরুটা বেঁধে রাখল। দুপুরে কিছু খায় নি। শরীর ভালো নেই বলে খাওয়ার সময় সাবিনাকে এড়িয়ে গেছে। বলেছে, তুই খেয়ে নে না সাবিনা। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। পরে খাব। এই বলে সে মাদুর পেতে চোখ বুজে পড়েছিল। সাবিনা কত যত্ন করে ভাত রেঁধেছে। ভাত সহজে হয় না। কোনো ভোজটোজের ব্যাপারে ভাত রান্না হয়। উপত্যকা পার হয়ে, ইউকনের বনের শেষে ছোট্ট বুড়ো দোকানী হাকমত বাস করে। ওর ওখানে আজকাল দেশলাইর বাক্স পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায়। ঘরে জন সামসের চাল সব সময় কিছু না কিছু রেখে দেয়। কাজ শেষে ফেরার সময় দোকানীর সঙ্গে দ্বীপের উন্নতি প্রসঙ্গে কথাবার্তা হয়। সাহেবদের বাংলোয় আর কি নতুন খবর আছে সে জেনে নেয়। জাভা থেকে এবার চালের ভালো চালান এসেছিল। বুড়ো দোকানী বলেছিল, কিছুটা চাল তুলে রাখতে। চালান সব সময় ভালো আসে না। যখন এসে গেছে, তখন কিছুটা রেখে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এত পরিপাটি করে মেয়েটা চাল সেদ্ধ করেছে। ঠিক ঠিক রান্না করতে সাবিনা পারে না। রাতে আবিন চাচাকে খেতে বলেছে।

সাবিনা ছ'একবার বাপকে বলেছে, কখন আর খাবে, তখন সামসের বলেছে, রাতেই একবারে খাব চাচার সঙ্গে।

সাবিনা বাপের মন ভালো নেই বুঝতে পেরেছিল। কি হয়েছে এখন সে জানে না। ভাবল আবিন দাছ ঠিক ঠিক বলতে পারবে। সে লণ্ঠন জ্বেলে টিলার রাস্তার ওপরে উঠে যেতে লাগল। আর আবিন দাছর ওখানে গিয়ে দেখল, সে একা নয়। উঠোনে লম্বা মতো একটা মানুষ বসে রয়েছে। মাথায় তালপাতার টুপি। লোকটাকে অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কাছে গেলে বুঝতে পারল, নানারকম পুরনো জামা কাপড় গরমের—লোকটা তবে জাহাজী, দাছর কাছে বেশি দামে বিক্রি করতে এসেছে। দাছ এইসব ফুল তোলা জামা প্যাণ্ট নিয়ে কালই হয়তো গাধাটাকে নিয়ে বের হয়ে পড়বে দূরে দূরে। ওদের ঘরে ঘরে সে ছ-চার শিলিং-এর বিনিময়ে কাপড় জামা বিক্রি করবে।

সাবিনাকে দেখে আবিন দাছ ভুরু তুলে তাকাল। খুব ভারি ভুরু। বুড়ো হওয়ার জন্য চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে। টেনে তুলে না দেখলে বুঝতে পারে না, অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে আছে। সাবিনাকে দেখেই বলল, অঃ তুই। আয়।

সাবিনা পাশের জলচৌকিতে বসা লোকটাকে দেখছিল। রঙ-বেরঙের প্রজাপতি আঁকা সার্ট গায় লোকটার। ওর চেয়ে খুব বেশি একটা বয়সও হবে না। ভারি ছেলেমানুষী মুখ যেন। লম্ফের আলোতে সে স্পষ্ট লোকটার মুখ দেখে বালিকার মতো হেসে দিল।

আবিন দাছ বলল, জন সামসেরের মেয়ে সাবিনা। সাবিনার দিকে তাকিয়ে বলল, নিয়ে যা না। ভালো গাউন এনেছে। পছন্দমতো কিনে রাখ। সে এবার জাহাজীটার দিকে তাকিয়ে বলল, যাওনা ওর সঙ্গে। তোমার এত সব কেনার ক্ষমতা তো আমার একার নেই। সামসের কিনতে পারে।

সুন্দর সুন্দর সব লেসওয়ালা ফ্রক এনেছে লোকটা। সাবিনা

পাশে লক্ষ রেখে হাঁটুগেড়ে বসল। তারপর পছন্দমতো ফ্রক শরীরের মাপ মতো হবে কিনা দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল। মেপে দেখল। যখন দেখল সাইজ ঠিকমতোই আছে, দৌড়ে কিছুটা আড়ালে চলে গেল। ফ্রকটা গায়ে দিয়ে ফিরতেই লোকটার চোখ ভারি দয়ালু দেখাল। সে বলল, খুব মানিয়েছে। একেবারে রাজপুত্রী দেখছি।

সাবিনা আবিন দাত্বকে বলল, দাত্ব লোকটা সত্যি বলছে তো!

—হ্যারে। তোকে আর যেতে দেব না। রেখে দেব ঘরে। এমন আলো করা বৌ আমি পাব কোথায়?

—দাত্ব আবার তুমি···।

ঠিক বলছি না মশাই? তোমার নামটা যেন কি বললে? মনে থাকে না মশাই! বুড়ো হয়ে গেছি। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

—আমার নাম সরিত।

—সরিত আবার কেমন নাম! তুমি কোন দেশের লোক।

—ভারতবর্ষের লোক আমরা।

—ভারতবর্ষ কথাটা শুনে সাবিনা চমকে উঠল। কত রাজা-বাদশা নবাব-আমির-ওমরাহ ওদেশে বাস করে। তাদের ছেলে এই জাহাজীটা। সে পাশে বসে গন্ধ শুঁকে দেখল। বাবা বলেছে, ওদের গায়ের গন্ধেই টের পাওয়া যায়, কত বড় মহান দেশের মানুষ।

সাবিনা দেখল গন্ধটা আর দশটা মানুষের মতোই। তবু তার মনে হল কেন জানি অপরিচিত একটা প্রাণ এই শরীরে মিশে আছে। ভারি সুন্দর যুবক, ঠিক যুবক না, তরুণই বলা চলে। সাবিনা বলল, আমাদের বাড়ী যাবে?

—কতদূর!

আবিন দাত্ব বলল, বেশি দূর না। একটু নেমে গিয়ে আবার দখিনমুখো উঠতে হবে তোমাকে। ওর বাপ মেয়েকে সাজাতে খুব ভালোবাসে। দামী জিনিসগুলো তোমার এখানে আর কেউ কিনবে না। সামসের মেয়ের জন্য সব কিনে রাখতে পারে।

জাহাজে কাজ করে বলে পৃথিবীর কোনো দেশই দেখতে বাকি নেই সরিতের। এই নিয়ে সে জাহাজে তিনটে সফর দিয়েছে। প্রথম দিকে জাহাজে সে কোলবয়ের কাজ করত। পরের সফরেই সে ফায়ার-ম্যান হয়ে গেছে। এ-সফরে জাহাজের সে একজন গ্রীজার। তার মা বাবা নেই। ভাইবোনেরা সবাই বড়। সবার বিয়ে থা হয়েছে। ভাই ভাইঝি ভাইপো ভাগ্নিদের জন্য দেশে ফেরার সময় পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে অদ্ভুত অদ্ভূত সব খেলনা, বাঁশের বাঁশি, তালপাতার কারু-কাজ করা পাখা, এবং একবার সে একটা প্যাংগোলিন পর্যন্ত তুলে নিয়েছিল জাহাজে, দেশে নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু কপাল মন্দ। ক'দিন পর সে দেখল ছোট্ট পিপীলিকাভোজী প্রাণীটা ওর বাংকের নিচে মরে পড়ে আছে। মরে গেছে, না কেউ মেরে ফেলেছে, কারণ ক'দিনেই সে বুঝে ফেলেছিল, ও হ্যাওটা হয়ে গেছিল মানুষের। পায়ে পায়ে ঘোরার স্বভাব জন্মে গেছিল। অলক্ষ্যে কারো পায়ের নিচে পড়েই হয়তো চ্যাপ্টা হয়েগেছে। দোষ স্বীকার না করে ওরই বাংকের নিচে ফেলে রেখেছিল।

তখন সাবিনা বলল, দাদু তুমি যাবে না? বাবা বসে আছে।

আবিনের খাবার কথা রাতে। সে বলল, যাচ্ছি। তোরা যা। ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে বাঁধতে হবে। ছোলা দিতে হবে। গাধা দুটোকে খোঁয়াড়ে ঠেলে দিতে হবে। হাতের কাজ সেরেই যাচ্ছি।

॥ চার ॥

সাবিনা আগে। পেছনে একটা ভিনদেশী মানুষ। মাথার ওপর নিরিবিলি আকাশ। সমুদ্র খুব শান্ত বলে কোনো গর্জন নেই! কেবল দূরে খাদের দিকে বুলডজারে ফসফেটের পাহাড় ভাঙছে—তার শব্দ কেমন মাদলের মতো একটানা বেজে চলেছে। এবং খুব দূরে বালিয়াড়ির মুখে আকাশটা সাদা। একটা অন্ধকার বনের মাথায়

সাদা আকাশটা ঝুলে আছে। নিভৃতে রয়েছে সব বড় বড় ইউকন গাছ। তার পাতায় আশ্চর্য খসখস শব্দ। উঁচু নিচু পাহাড়ী টিলা ভেঙে সাবিনা ভিনদেশী লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে। ঠিকমতো লোকটা পথ চিনে জাহাজে ফের অন্ধকারে যেতে পারবে তো! সে বলল, ও মানুষ তুমি যেতে পারবে তো চিনে?

সরিত চারপাশে তাকিয়ে বুঝল, বেশ একটা নিচু মতো জায়গায় এসে গেছে। পাশে পাথরের মসৃণ দেয়াল, ঠিক যেন অনেকটা পাঁচিলের মতো। ফাঁকে ফোকরে নানারকমের গাছপাতা ফুল। সে বলল, খুব চিনে যেতে পারব।

—অ মানুষ, কতদিন তুমি থাকবে গো?

—তা এখানে উনিশ মাসের মতো। জাহাজের কাপ্তান তো তাই বলে।

—এমন সুন্দর জামা কাপড় কোথায় পাও গো?

—কত দেশ আছে। কত সুন্দর সব রকমারী পোশাক আছে পৃথিবীতে, তুমি তো তার কিছুই দেখলে না।

সাবিনা লম্ফ তুলে এবারে ফিরে দাঁড়াল। ভালো করে দেখে নিচ্ছে। বেশ লম্বা মতো মানুষ, একমাথা চুল, ওদের স্বজাতিদের মতো মানুষটার নাক থ্যাবড়া না। চোখ গোল গোল না। মোটা বেটপ বেঁটে মতো না। মানুষটার শরীর প্রভু একেবারে নিখুঁতভাবে পাথর দিয়ে খোদাই করে করেছে। চোখ বড় বড়।

সাবিনার চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। সামান্য বাতাসেই চুল ফুর ফুর করে উড়ছে। মুখে চুল এসে পড়লেই হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। সরিতের কেমন মনে হচ্ছিল, কিছুটা বনদেবীর মতো সাবিনা। সে বলল, তোমরা এ দ্বীপে কতদিন আছ?

—আমার বাবার বাবা এসেছিল ফিজি থেকে। আমাদের ধর গিয়ে তিন পুরুষ হয়ে গেল। আচ্ছা, বলেই আবার হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমাদের দেশটা দ্বীপটার চেয়ে কত বড় হবে গো?

সরিত কি বোঝাবে! বলল, সে অনেক বড়।

—বাবাও তাই বলে। ফিজির চেয়েও বড়। সে কত বড় কিছু বুঝি না ছাই! বুঝতে না পারলে আমার খুব খারাপ লাগে। তখন কি যে হয়!

—কি হয়?

—হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

নাবালিকার মতো ভারি সহজ সরল কথাবার্তা। যদিও বয়সে একেবারে যে নাবালিকা, তা বলা চলে না। নাকি দ্বীপটায় থাকলে কিছু কিছু সরলতা এমনি গজিয়ে ওঠে, সে বুঝতে পারল না। শুধু বলল, তোমার দেশটা ভারি সুন্দর।

—জানো আমাদের তিনটে ক্রেন আছে দ্বীপে। একটা ছোট্ট শহর আছে। ঐ যে দেখছ, দেখছ না, ইউকনের বনটা, বনটার মাথায় ত্যাখো আকাশটা, দেখতে পাচ্ছ, খুব সাদা লাগছে না, ওখানে আমাদের একটা শহর আছে। স্যামসন সাহেবের দেশ ওটা। স্যামসন সাবের একটা ঘোড়া আছে। একটা বন্দুক আছে। তার সাঙ্গোপাঙ্গ দেশী জাতভাইরা ওখানটায় থাকে।

সরিত বলল, সত্যি!

—হ্যাঁ, আর জানো, আমাদের দ্বীপে আঠারোটা পিপে আছে। সব সুদ্ধু আছে ছ'টা ঘোড়া। ওই যে আবিন দাদুকে দেখলে ওরই জিম্মায় থাকে দুটো ঘোড়া। তুমি তো মাঝে মাঝেই আসবে এখানে। তোমাকে নিয়ে মানগানু উপত্যকায় যাব। দেখবে কি মজা, নিচে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। কামারু দালালকে তো দেখ নি। ইয়া বড় গোঁফ। স্যামসন সাবের মতো লম্বা গোঁফ রাখে। ওর আট গণ্ডা বেড়াল আছে।

—আটগণ্ডা বেড়াল!

—অমা! তুমি এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছো!

—ঘাবড়াবারই কথা!

—আমাদের দ্বীপে আটাশটা ছাগল, তিনটে ষাড় আছে। পিনচি পাহাড় আছে।

সামান্য একটু দ্বীপের জন্য কি গর্ব সাবিনার! সে বলল, জানো তুমি দ্বীপটার যে কোনো টিলায় উঠে দাঁড়ালে সমুদ্র দেখতে পাবে!

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। কিন্তু জানো, সকাল থেকে আমার বাপের মন ভারি খারাপ। খাচ্ছে না। দুপুরে খেতে বললাম, বলল, ঘুমিয়ে নি। বিকেলে বললাম, বলল, রাতে একসঙ্গে আবিন চাবার সঙ্গে খাব। তাই আবিন চাচাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস গিয়েছিলাম।

সরিত কাপড়ের পুঁটুলিটা এবার কাঁধ পাল্টে নিল। —তোমার কষ্ট হচ্ছে ভিনদেশী মানুষ? আমায় দাও না। আমাকে এত ছোট ভেব না। অনেক কাজ করতে পারি আমি।

—ও ঠিক আছে। আমি পারব। এ নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

সরিত বেশ মজা পাচ্ছিল মেয়েটার কথা-বার্তায়। সে বলল, আর কতদূর?

—আরে ঐ তো! তুমি কেমন মানুষ গো। তোমার দেশটা বলছ আমাদের চেয়ে বড়, সেখানে তো ঐটুকু হাঁটলে চলে না। এতটুকু হেঁটেই হাঁফিয়ে পড়ছ!

—না, এমনি বললাম। তারপর সাবিনার মতো দুটো পাথর পর পর লাফিয়ে গেল। শেষে বলল, ভাগ্যিস গিয়েছিলাম বললে কেন সাবিনা?

সাবিনা লজ্জায় ফিক করে হেসে দিল। বলল, না গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হত না! ভারতবর্ষের মানুষ দেখতে এমন সুন্দর হয় কি করে তবে জানতাম বাপু, বল?

॥ পাঁচ ॥

সামসের বুঝতে পারছে না, মেয়েটার ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন। সে বুঝতে পারছে না, কতটা দেরি করছে—তবু তার মনে হয়েছিল খুব দেরি হচ্ছে। আসলে মাথায় নানা রকম দুর্ভাবনা থাকলে যা হয়। কতদিন কত রাত করে একা একা ফিরেছে সাবিনা। আজকের মতো সামসের এত বিচলিত কখনও হয় নি। সে আর থাকতে না পেরে কিছুটা নেমে গেছে বাড়ি থেকে। তখনই মনে হল ঝিংকি হ্রদটার পাশে কেউ আলো হাতে আসছে।

অন্য কেউ হতে পারে ভেবে সে জোরে ডাকল —সা···বি···না।

আশ্চর্য প্রতিধ্বনি হয় এ-দ্বীপটাতে। জোরে চিৎকার করে ডাকলে গম গম করে বাজে। মিউজিকের মতো ছড়িয়ে যায়।

সাবিনা তখন সাড়া দিল—যা···ই।

সামসের লুঙ্গির মতো পরেছে একটা তোয়ালে। গেঞ্জি গায়। সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। সে আর এগিয়ে গেল না। বাড়ির নিচেই দাঁড়িয়ে ফের হাঁকল, এত দেরি কেন রে ? আবিন চাচা আসছে ?

—আ···স···ছে। দেরি হবে···না! দ্যাখোনা কাকে সঙ্গে এনেছি। বলতে বলতে ওরা চলে আসছিল। ওদের ছায়া জলে পড়ছে। সরিতের মনে হচ্ছিল, স্বপ্নের মতো ঘটনা। এমন সুন্দর অন্ধকার আচ্ছন্ন হ্রদের পাশ দিয়ে সে জীবনেও যেন হেঁটে যায় নি। এক জীবনে এটা মানুষের কখনও হয় সে ভাবতে পারে না। সে বলল, খুব দেরি হয়ে গেছে। তোমার বাবা বকবে।

—বাবা আমাকে বকে না। আগে তবু বকত, কিন্তু মা কুটুমবাড়ি যাবার পর বাবা খুব ভালোমানুষ হয়ে গেছে। একটুকুতেই বাবা কেমন দিশেহারা হয়ে যায়।

—কবে গেছে কুটুমবাড়ি।

—সে তো তোমার জাহাজটার আগের জাহাজটার আসার দিন।

সরিত জানে এ দ্বীপের সঙ্গে একটা চুক্তিমতো থাকে কোম্পানীর। তখন কোম্পানীর একটা জাহাজ শুধু এ দরিয়াতেই থাকবে। পাঁচ সাত'শ মাইলের ভেতর এমন আছে আরো কয়েকটা দ্বীপ। দ্বীপ-গুলোতে প্রচুর ফসফেট। ফসফেট চালানের সুবন্দোবস্ত আছে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলবাসীদের সঙ্গে। জাহাজটার কাজই তখন বার বার আসা আর যাওয়া। বার বার এসে দ্বীপগুলো থেকে ফসফেট তুলে নেয়। তারপর অস্ট্রেলিয়ার দিকে অথবা নিউজি-ল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করতে হয়। পনের বিশ দিন লেগে যায়। মাল খালাস করে ফিরতে মাসের ওপর লেগে যায়। দু'চার দিন এক একটা দ্বীপে থাকে। ফসফেট বোঝাই হয়ে আর একটা দ্বীপে, আবার ফসফেট বোঝাই, আবার যাত্রা—এবারে ওরা এখানে কাজ করবে উনিশ মাসের মতো, এ দ্বীপে কম করে তাদের পাঁচ সাতবার আসতে হবে। সুতরাং আগের জাহাজটার কথা ভাবতেই বুঝে নিল দেড় দু'সাল আগে তার মা কুটুমবাড়ি গেছে। দেড় দু'সাল কারো মা কুটুমবাড়িতে পড়ে থাকে কি করে! সে বললে, তোমার মা বুঝি রাগ করেছে!

—ধুস তুমি যে কি না! মা রাগ করবে কেন? রাগ করলে বাবা কখনও কাঁদতে পারত! মাকে রেখে এসে বাবার কি কান্না!

—কুটুমবাড়ি কত দূরে!

—কাল তোমাকে দেখাব। পিনচি পাহাড়ে উঠে গেলে দ্বীপটা দেখা যায়।

—তোমাদের আর কে আছে ওখানে?

—সে তো জানি না। এস না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাব।

সাবিনার সঙ্গে যত কথা বলছে তত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে সরিত।

পৃথিবীর কোথাও এমন একটা সরল পরিত্র মুখ যেন সে দেখে নি। সে বলল, আমাকে দেখলে তোমার বাবা রাগ করবে নাতো! বলছ, তোমার মন ভালো নেই।

তখনই কে যেন কিছু বলল।

—কি বলছে!

—ওমা, তুমি আমাদের কথা বোঝ না জানতামই না। আমার কথা তুমি সব বুঝতে পার তো!

—তোমরা তো সবাই ইংরেজিতে কথা বল। আমি যে কিছুটা জানি।

—বাবা তো জানে না, তুমি আমার সঙ্গে আছ। বাবা বলছে, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি।

—ওঃ।

সাবিনা বলল, বাবা, ভারতবর্ষের মানুষ। বাবা, কি সুন্দর মানুষ। বাবা, তুমি এস না। তুমি যে বলেছিলে মানুষরা খুব সুন্দর হয়।

সরিত ভীষণ লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে। দেখতে সে মোটামুটি ভালো। খুব কম বয়সে বয়স ভাঁড়িয়ে ভদ্রা জাহাজে ট্রেনিং নিয়েছে। এখনও তার বয়স বিশ পার হয় নি। তিনটে সফরে সে কত রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। বেশি কিছু জিনিস দেশে কিনে নেবার জন্য পুরনো জামা প্যাণ্ট কিনে এনেছে। সারেঙ হাস্‌মতালি বলেছে, নারু, কাকাতিয়া, ওসানিক দ্বীপে বেশ কদর। বিক্রি করে দু' পয়সা মুনাফা করা যায়। আর যাদের ছিল, তারা আগেই কাকাতিয়ায়, ওসানিকে বিক্রি করে ফেলেছে। ওর শরীর ভালো ছিল না। জ্বর জ্বালায় ক'দিন বাংকে শুয়েছিল। সে এখানে এসে বুঝতে পেরেছিল, মাল সব বেচে না দিলে ফেরত যাবে। এবং সে জাহাজ খাঁড়িতে নোঙর ফেলতেই সারেঙকে বলে নেমে এসেছে। আর নেমে এসেই কি যে এক আশ্চর্য পৃথিবীর সন্ধান পেয়ে গেল! তার মুনাফা হয়েছে বেশ। সে ইরার জন্য একটা মনিবন্ধ ঘড়ি কিনবে ভেবেছে। ইরা বলেছে, ভালো পাশ করলে,

কাকা আমায় একট ঘড়ি দিও। মনটা ওর ভীষণ খোস মেজাজে আছে। তায় আবার সাবিনার মতো এক বালিকা তাকে এতটা পথ দেখিয়ে এনেছে। লম্ফের আলোতে মনে হয়েছে—কোনো এক প্রাচীন বুদ্ধ-মন্দিরের পথে হেঁটে যাচ্ছে। সভ্যতার যেন তখন সবে বিকাশ হয়েছে। সাবিনার কথাবর্তা শুনে তো তাই মনে হয়। উড়োজাহাজ দেখেছে কিনা, একবার ভাবল জিজ্ঞেস করবে।

তখনই কর্ কর্ করে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

সাবিনা বলল, শয়তানটা বুঝতে পারছে আমি ফিরে এসেছি। আজকাল একদম কথা শোনে না। কি পেটুক!

সরিত কিছু বলার আগেই সামসের বলল, তুমি জাহাজে এসেছ বুঝি!

সরিত পোঁটলাটা উঠোনে নামিয়ে বলল, ব্যাংক লাইনের জাহাজ। ভালো ফ্রক আছে।

—দেখাও তো! ও সাবিনা, বাইরে মাদুর পেতে দে!

লম্ফটা খুঁটিতে ঝুলিয়েভেতরে ঢুকে গেল সাবিনা। কাঠের পাটাতন দেওয়া ঘর। প্রায় পায়রার খুপরির মতো। ছোট ছোট জানালা, খুব নুয়ে ঢুকতে হয়। প্রায় হামাগুড়ি দিলেই যেন আরও ভালোভাবে ঢোকা যায়। এবং সাবিনা হামাগুড়ি দিয়েই ভেতরে ঢুকে একটা মাদুর নিয়ে এল। বাবা খুব একটা আশ্চর্য হচ্ছে না দেখে। বরং একজন ফেরিওয়ালার সঙ্গে যেভাবে কথা বলা দরকার বাবার কথাবার্তা ঠিক সেই রকমের।

সাবিনার ভীষণ রাগ হচ্ছিল বাপের ওপর। মানুষটাকে একদম ইজ্জত দিচ্ছে না। দর-দাম করে বলছে, তুমি ভিনদেশী মানুষ, এত দর হাঁকছ কেন! মুনাফা না হয় কিছু কমই করলে।

সরিত বলল, কত দেবেন!

—দু' শিলিং করে দাও তো, তিনটেই রেখে যেতে পার।

সরিত বলল, যখন বলছেন, আর আপনার মেয়েরও যখন খুব সখ,

দিয়ে যাচ্ছি। বলে সারিত তিনটে ফ্রকই বের করে দিল। ফ্রকগুলো বড় মাপের। ওতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। মাপ মতো সায়া সেমিজ কেউ কখনও এদ্বীপে পরেছে বলে জানা নেই। সাহেবদের জামা-প্যাণ্ট তৈরি হয়ে আসে বিদেশ থেকে। মেয়েরা শরীরের সবটা ঢেকে গেলেই খুশি।

সামসের কাঠের পেটি থেকে গোনাগুনতি ছ'টা শিলিং নিয়ে এল। বেশ রাত হয়েছে। আবিন চাচারও এক সময় হাঁক শোনা গেল। সরিতের জল তেষ্টা পেয়েছে। সে বলল, এক গ্লাস জল খাওয়াবে মেয়ে!

ঠাণ্ডা তরমুজের খোল থেকে সে বের করে দিল জল। সরবতের মতো মিষ্টি। সাবিনা বলল বাপকে, ভিনদেশীকে বলনা আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে।

সামসের বুঝতে পারে ভিনদেশীকে সাবিনার খুব ভালো লেগে গেছে। সে বলল, মেয়ে বলছে খেয়ে যেতে।

সরিত বলল, আর একদিন এসে খাব। আজ বরং উঠি।

আবিন চাচা বলল, কি বলেছি না, সামসেরের কাছে যাও বাকি ক'টা রেখে দিতে পারে।

—তা রেখেছে দাদু।

আবিন চাচা বলল, যখন বলছে খেয়েই যাও না। বাড়া ভাত ফেলে যেতে নেই।

সাবিনা তখন একটা লম্বা ফ্রক পরে ফেলেছে। সোনালী গাউন, সাবিনার পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটাচ্ছে। লম্ফের আলোতে সে বুঝল ঢোলা পোশাকেই সাবিনার শরীর আরও বেশি রহস্যময় দেখাচ্ছে। আর একবার না বললে খেয়েও যেতে পারছে না।

সাবিনা বোধহয় মুখ দেখে ধরে ফেলেছে। সে বলল, বাবা ইয়া বড় একটা সুরমাই মাছ ধরে এনেছিল। পুঁদিনা পাতার বড়া হয়েছে মগজের। তারপর দুধ দিয়ে শংখি ফুলের পায়েস। গোল গোল মিষ্টি আলুর তরকারি। আদা বাটা রসুনে মাছের ভাপ।

এবং ভারি মন দিয়ে সে সারা সকাল রান্না করেছে, এমন সবও বলে ফেলল। কেউ যেন আসবে, কোনো ভিনদেশী অতিথি, তা না হলে এত যত্ন করে সে কখনও আজ পর্যন্ত রান্নাবান্না করেছে বলে মনে পড়ে না। রান্নার সময় ওর মাথা গরম হয়ে যায়। কতক্ষণে করমর্‍াঁত পাখিটাকে নিয়ে মানগান্থ উপত্যকায় উঠে যাবে, কতক্ষণে সেই পাথরের বিরাট চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখবে উঁচু থেকে নিচে পড়ছে প্রপাতের জল, রঙ-বেরঙ সব মাছেরা ভেসে আসছে দেখবে, তা না কেবল খাওয়া আর খাওয়া। এটা রেঁধে রাখিস, ওটা সেদ্ধ করে রাখিস, আলুটা ভিজিয়ে রাখিস, বাপ যে তার কত রকমের খেতে ভালোবাসে! খাওয়াটা কি করে মানুষের সব হয় সে বুঝতে পারে না। তার মনে হয় কেবল নিরন্তর দ্বীপের গাছপালার ভেতর ছুটে বেড়ানো, হরতুসকে নারকেল গাছের ডগায় তুলে দিয়ে মজা দেখা অথবা শংখি ফুল তুলে মালা গাঁথার ভেতর অন্য এক জীবন তাকে হাতছানি দিচ্ছে। বাপ সেটা বুঝতে চায় না। লুকিয়ে চুরিয়ে আজকাল আজগুবি সব স্বপ্নের কথা হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে ইউকন গাছের বনটাকে বলে দেয়। বনের দেবী পামিলা ঠিক ওর মনের কথা বুঝতে পারে তখন। বলে, জানো, আমি যে দেখি স্বপ্নে এক রাজপুত্র ভেলায় চড়ে আমাকে নিতে এসেছে। সারা দ্বীপে সব জোনাকিরা আলো দেয়। তার ভেতর সেই সুন্দর মতো মানুষটা হেঁটে যায়। আকাশে নক্ষত্র জ্বলে। দেবী, তুমি জানো সে কে? স্বপ্নে কেন দেখি তাকে! বাবা যখন গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে তখনও মনে হয় একজন কেউ আমার জন্য বালিয়াড়িতে অপেক্ষা করছে। সে একটা দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। দ্বীপে কিছু নেই। কেবল শুধু বালি। লোকটা নৌকায় করে জল নিয়ে যায়, গাছপালা নিয়ে যায়। আমি হালে বসে থাকি। মরুভূমির মতো দ্বীপটা, জানো, তারপর কেমন সুন্দর সবুজ ছোট্ট একটা হ্রদে মিষ্টি জল, টিলার মতো উঁচু জায়গায় পাতার ঘর। সারাদিন লোকটা কেবল খাটে। আমি তাকে তালপাতার পাখায় হাওয়া করি।

সাবিনা কেবল দেখছিল সরিতকে। সেই মানুষটি কি তবে সত্যি চলে এল! নিজের ভেতরেই লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সামসের কলাপাতা কেটে আনছে। আবিন চাচা কিছুটা জল ছিটিয়ে দিল। হাওয়ায় ধূলোবালি উড়তে পারে। সাবিনা খুব যত্ন করে আলাদা আলাদা খাবার মাটির পাত্রে ঢেলে দিচ্ছে। নিজের জন্য কিছুই আজ আর রাখতে ইচ্ছে করছে না।

বেশ ভুরিভোজনের পর সরিত বলল, রান্না-বান্না খুব সুন্দর হয়েছে সাবিনা।

সাবিনার ইচ্ছে হয়েছিল, একটা মাদুর গাছের নিচে বিছিয়ে দেয়। মানুষটা একটু শুয়ে থেকে যদি আরাম পেত।

সামসেরের মন ভালো নেই বলে খুব একটা কথা বলছে না। আবিন দাদুর কথাবার্তা কেবল সামসের আর সাবিনাই বুঝতে পারছে। বাবা ভীষণ একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। এবং কেমন মুখটা মাঝে মাঝে কঠিন দেখাচ্ছে। সে বুঝতে পারল না, ওর বাড়াবাড়িতে বাপ এমন রেগে যাচ্ছে না তো! ভিনদেশী মানুষটাকে সে বলল, চল তাড়াতাড়ি খাঁড়ির পথে নামিয়ে দিয়ে আসব। বাপ রাগলে চণ্ডাল বনে যায়।

সরিত বলল, যাই সামসের চাচা। আবিন দাদু, কাল আসব বিকেলে। চারপাশে দেখছি লেবুর জঙ্গল। কেউ তোমরা লেবু খাও না?

সামসের গম্ভীর গলায় বলল, ভালো কাঁচের চুড়ি আনলে আমার মেয়েটাকে দিয়ে যেও।

আবিন চাচা বলল, সাবিনা, ওকে এগিয়ে দিয়ে আয়। রাস্তা হারিয়ে ফেললে দ্বীপে সারারাত ঘুরে মরবে।

তখন সাবিনা ফিস ফিস গলায় নিচে নেমে বলল, এই ভিনদেশী, আমার শয়তানটাকে তো দেখতে চাইলে না।

—সেটা কি!

—দাঁড়াও নিয়ে আসছি।

দু-লাফে সাবিনা উঠোন পার হয়ে ভেতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওখানে একটা বড় আমলকি গাছ, আখের জঙ্গল এবং দু' চারটে ইউকন গাছ। গাছগুলোর অভ্যন্তর থেকে রহস্যময়ী নারীর চোখে তার দিকে তাকাল সাবিনা। তারপর কি খুলে ফেলল। কাছে এলে বুঝতে পারল একটা ডাহুক পাখি। তবে সঠিক ডাহুক নয় যেন। গলাটা লাল রঙের। ঠোঁট সোনালী রঙের। মুক্তোর মতো চোখ। বগলে চুপ মেরে আছে।

সরিত হাঁটতে হাঁটতে বলল, পোষা পাখি ?

—পোষা না ছাই। ছেড়ে দিলেই উড়ে যান উনি। কিছুতেই বাড়ি ফিরতে চায় না। কত রকমের বায়নাক্কা তখন। বাবা, আমি, হরতুস সবাই তখন পাখিটাকে খোঁজার জন্য সারা দ্বীপ ঘুরে বেড়াই। এখন আর পারে না পালাতে। পায়ে আংটা লাগিয়ে দিয়েছি।

—তোমাকে খুব ভালোবাসে ?

—ভালোবাসে না ছাই।

এবং সরিত দেখেছে কথায় কথায় ছাই কথাটা বলে ফেলে সাবিনা। ওর তখন হাসি পায়।

সরিত বলল, পাখিটাতো খুব সুন্দর। তারপর সাবিনা কিছু বলার আগেই সরিত তাড়াতাড়ি আবার ওর মতো করে বলে ফেলল, সুন্দর না ছাই।

—এই ! বলে সে ঠেলা দিল একটা সরিতকে।

—পড়ে গেলে কি হত ? সরিতই আবার ওর মতো করে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, পড়ে গেলে কিছু হত না ছাই !

—আমি আর যাব না। তুমি ভালো না ভিনদেশী।

সরিত দেখল মেয়েটা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ! সে এবারে হাসতে হাসতে বলল, ঠিক আছে আর বলব না। আমি হারিয়ে গেলে তুমি কষ্ট পাবে। কি ঠিক বলি নি !

—কেন এত কষ্ট মানুষের ভিনদেশী তুমি বলতে পার !

সরিত ঝিংকি হ্রদের পাড়ে এসে নেমেছে। মেয়েটা কি সব কঠিন প্রশ্ন করছে—সে ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারছে না। সাবিনাকে আর বালিকা ভাবাই যায় না। প্রায় যুবতীর মতো লম্বা গাউনে তার শরীর ঢাকা। আর ভারি সুন্দর ঘ্রাণ শরীরে।

সে বলল, মিষ্টি সুগন্ধটা কোত্থেকে আসছে !

সে তার শরীর দেখিয়ে বলল, এখানে আছে।

সরিত কেমন বিহ্বল হয়ে যায়। আসলে সাবিনা আর বালিকা নেই। রহস্যময়ী নারীর গন্ধ শরীরে ফুটে উঠেছে। এবং এমন নির্জন রাস্তায়, অন্ধকারে জোনাকির আলোতে, দ্বীপের বাতাসে, সমুদ্র-গর্জনে শুধু গন্ধটা পাওয়া যায় ! কোনো শহরে, অথবা শরীরে পাপ থাকলে, এটা টের পাওয়া যায় না। সে বলল, কাল আসব। সারা দিন আমাদের কাজ। বিকেল হলেই ছুটি। খুব লেবু বন চারপাশে দেখছি। আমার জন্য কটা লেবু তুলে রাখবে। কাল নিয়ে যাব।

সাবিনা বলল, তুমি আর কিছু নেবে না ভিনদেশী ?

সরিত সেই পাথরের পাঁচিল পার হয়ে যাচ্ছে তখন। বলল, না।

—তোমার জন্য যদি কিছু শংখি ফুল তুলে রাখি ?

—শংখি ফুল দিয়ে কি হবে ?

—যদি সুন্দর একটা মালা গাঁথি !

এভাবে বোধহয় কোনো পবিত্রতা আছে শরীরে মেয়ের। কত সহজেই মালা গাঁথার কথা বলে দিতে পারে। কোনো সংকোচ নেই। ভারি অবোধ বালিকা যেন। সে বলল, রেখ। নিয়ে যাব।

—ঠিক আসবে তো ?

—আসব।

—চিনে আসতে পারবে তো ?

—হারিয়ে যাব কোথায় ?

—কত জায়গা থাকে মানুষের।

—আমি ঠিক উঠে যাব। রাস্তা হারিয়ে ফেললেও ভুল করব না। গন্ধটা ঠিক পাব। যতদূরেই থাকি, তুমি কোথায় আছ বুঝতে পারব।

সাবিনা বলল, ঐ ছ্যাখো তোমার জাহাজ। আর ঐ দেখ অনেক উঁচু টিলাতে যে আলোটা, ওটা আবিন চাচার বাড়ির খুঁটিতে ঝোলানো। ডান দিকে সামান্য নিচে দেখ, আর একটা আলো। ওটা আমাদের বাড়ি। ভুল কর না যেন।

॥ ছয় ॥

সামসের মাদুরে মুখ গুঁজে বসেছিল। আবিন চাচা লম্বা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। দিনরাত কাজ চলছে দূরের খাদগুলোতে। জাহাজ আসার আগে কুলি-কামিনরা ফসফেটের পাহাড় বানিয়েছে ঠিক জেটির কাছাকাছি। ক্রেন তিনটের এখন শুধু পিপে ভর্তি মাল জাহাজের খোলে পৌঁছে দেওয়ার কাজ। দিনরাত কাজ হচ্ছে। ছোট আকারের বুলডোজার দিয়ে খাদের চারপাশ ভাঙ্গা হচ্ছে। খাদগুলো এ-ভাবে ক্রমশ বড় হয়ে যায়। যত বড় হয়ে যায় তত মুনাফা স্যামসন সাহেবের। জন সামসের ভেবে তখন কুলকিনারা পাচ্ছে না। আর দশটা সুন্দরী মেয়েদের কপালে যে দুর্ভাগ্য লেখা ছিল সাবিনাও তার থেকে বাদ গেল না। তখনই কামারুর গলা পাওয়া গেল। গাধার পিঠে চড়িয়ে সে কিছু মালপত্র নিয়ে এসেছে। এবং যখন মালগুলো নামানো হচ্ছিল সামসেরের বুকটা কেঁপে গেল। এক টিন কোরোসিন তেল, দুটো কচ্ছপ, গোটাচারেক মুরগি, কাঠের কারুকার্য করা বাক্সে পাথরের মালা, রূপোর কঙ্কন আর দু' জোড়া সোনালী গাউন।

কামারু বলল, সামসের, এবারে তুইও দুটো গাধা পেয়ে যাবি। তোর আর ভাবনা কি!

আবিন চাচার হুঁকোর নল থেকে ক্রমে ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দটা উঠতে উঠতে সহসা থেমে গেল। সে একটা কথাও বলতে পারছে না। মাচিনকে নিয়ে যাবার সময়ও মাচিনের মরদকে এ-ভাবে প্যাংকো সাহেব

উপঢৌকন পাঠিয়েছিল। সে সবই বুঝতে পারছিল। কিন্তু অবোধ একটা বালিকার প্রতি লোভ, স্যামসনের খুব কাদাকার কুচ্ছিত একটা মুখের অবয়ব এঁকে দিল। মানুষের ওপর বিধাতা থাকলেই হয় না। বিবেক না থাকলে মানুষ খুবই স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। আবিন চাচা এটা বোঝে। মানুষের স্বভাব এই রকমেরই!

আবিন চাচা বলল, ওঠ। কি আর করবি। দ্বীপে যখন থাকতে হবে, তখন আর কিছু করার নেই। উতলা হস না। দু'দিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা এত সুখে রাখবে দেখবি, সাবিনা তোর কথা ভুলেই যাবে।

সামসেরের চোখ দুটো লাল। যেন সবাইকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে। সে উঠে গেল দেখে, আবিন চাচা আশ্বস্ত হল। মাথা ঠাণ্ডা রাখাই দরকার এ-সময়। যে যত গোলমাল করেছে, তার নসিব তত পুড়েছে। কারো কারো খোঁজ একেবারেই পাওয়া যায় নি। চারপাশে এত বড় বিশাল সমুদ্র, কোথায় কিভাবে হাঙ্গরের পেটে তাজা মাংস সব চলে গেছে জানতেও পারে নি তারা। বড় ঠাণ্ডা মাথায় নির্বিঘ্নে কাজকর্ম করার স্বভাব দানবটার। দানব ছাড়া এ-মুহূর্তে স্যামসন সাহেবকে সে আর কিছু ভাবতে পারল না।

জন সামসের উঠে দাঁড়াল। আকাশ দেখল। অজস্র নক্ষত্র আকাশে। সে ধর্মভীরু মানুষ। সে বোধহয় দূরের গীর্জার দিকে তাকিয়ে আরও কিছু দেখছে, অথবা শেষবারের মতো প্রার্থনা করছে। তা ভালো। আবিন চাচা নিজেও উঠে এসে গীর্জার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সাবিনার হয়ে দু' হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা জানাল। এখন সামসের হেঁটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে টলছিল। কামারুর সঙ্গে স্যামসনের বাপের আমলের দু'জন ট্যাঁস এসেছে। প্রবীণ, কানে মাকড়ি। মুখ লম্বা। যমদূতের মতো চেহারা। সারা গায়ে উল্কি।

সামসের এবারে কাছে গেল। নুয়ে লণ্ঠনের আলোয় সব দেখল। এক টিন কেরোসিন ভারি মহার্ঘ বস্তু। মাছের চর্বি জমিয়ে রাখে তারা।

লম্ফের সলতেয় চর্বি পোড়া গন্ধ থাকে—এ তেলটা তার থেকে একেবারেই আলাদা। এবং অনেকদিন সে রাতে বেশ ঝলমলে বাতি জ্বালাতে পারবে খুঁটিতে। তারপর কচ্ছপ ছুটোর বুকে পা রেখে উঠে দাঁড়াল। ছুটো কচ্ছপই তেজী মানুষটার ভারে গলা লম্বা করে দিয়েছে। তারপর সে কাঠের বাক্সটা হাতে নিয়ে দেখল। ভেতরে খুলে দেখল দশটা গিনি। লোভ, লোভে ফেলে দিচ্ছে তাকে সকাল থেকেই।

কামারু বলল, কি আর দেখছিস! পাবি না! এত দিয়ে কেউ কোনোকালে সুন্দরী কিনে নিয়ে যায় নি। যাই বলিস মানুষটার দিল আছে।

আর তখনই ধাঁই ধাঁই। জোরে, সজোরে—এটা কি করছে সামসের—পাগল হয়ে গেলনা তো! শব্দে, চিৎকারে তিরপিতির বাড়ি থেকে মানুষজন ছুটে আসছে। হরহুস দৌড়ে পাথর পাহাড় টপকে চলে এল। আর সামসের লাথি মেরে সব নিচের খাদে ফেলে দিচ্ছে। চোখ ঘুরছে। যমদূতের মতো লোক ছুটোও কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে।

আবিন চাচা চিৎকার করছে, কি করলি রে বেটা।

—তুমি চুপ কর হারামির বাচ্চা। তুমি কিছু বলনা বলেই পেয়ে গেছে।

—তোকে ছেড়ে দেবেনা রে! কেন অকল্যাণ ডেকে আনছিস দ্বীপে!

কে কার কথা শোনে! আবিন চাচার সামনেই সেই যমদূতের মতো লোক ছুটো সামসেরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিমেষে কব্জা করে ফেলল তাকে। সকাল বেলাতে সামসের যেমন কপিকলে মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলেছিল, ওরা তিনজন, কামারুও হাত লাগিয়ে একেবারে পিছমোড়া করে গাধার পিঠে তুলে নিয়ে গেল সামসেরকে।

আবিন চাচা বলল, যীশুরাজ তুমি গোঁয়ারটাকে দেখ। গোঁয়ারটার

মাথা গরম। ওরা রাজা মানুষ, ওদের মর্জিকে মান্যি না করলে চলে? সাবিনা এখনও ফিরে আসছে না কেন? না, রাস্তা থেকে ওকেও তুলে নিয়ে গেল! অত বোকা বোধ হয় স্যামসন নয়। সে যেভাবে হোক বাপদের, মরদদের কব্জা না করে কখনও কারো গায়ে হাত দেয় না। বেশ পরিপাটি করে খাওয়ার স্বভাব মানুষটার। গোলমাল একদম পছন্দ করে না। তার আমলেই দ্বীপের যত উন্নতি। রক্ষিতাদের সন্তান যারা, তাদের জন্য দ্বীপে একটা স্কুলও বানিয়ে দিয়েছে। ওদিকের শহরটায় না গেলে কিছুই বোঝা যায় না। একেবারে আলাদা হয়ে আছে দ্বীপ থেকে যেন। পাঁচ সাতটা সাহেব মানুষ কি দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে যাচ্ছে। স্যামসনের বাবার ছিল গোটা বাইশেক, কিন্তু স্যামসন, প্যাংকো, লিয়াক, বদরু সাহেবেরও কত যে ছানা-পোনা! মাছের ডিমের মতো মনে হয়। গোনাগুনতিতে শেষ হয় না যেন। এবং স্যামসন মানুষটার বয়স যে কত! আকালের বছর আবিন চাচা জোয়ান মানুষ। স্যামসন দেশ থেকে তখনই বাপের সঙ্গে চলে এসেছিল। বাপ মরে গেলে সে আর দেশে ফিরে যায় নি। এমন কায়েমী রাজত্ব আর কোথায় মিলবে!

সাবিনা বাড়িতে ফিরে দেখল একটা তছনছ অবস্থা। আবিন চাচা মাদুরে শুয়ে আছে। এখানে সেখানে সে দেখল পাথরের মালা, কচ্ছপ, ছেঁড়া গাউন, বরণডালার মতো কিছু হলুদ রঙে ছোপানো পিটুলির প্রদীপ, আরও কত কিছু সব, কেমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার মতো। সে ডাকল, বাবা! সাড়া পেল না। আবিন চাচা ধড়মড় করে উঠে বসল। এবং আবিন চাচার কাছে এটা খুব একটা ভয়ংকর কিছু না। ওখানে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সজোত করে দেবে। এবং ভালো মানুষের মতো ফিরে নিজেই হাত ধরে নিয়ে যাবে মেয়েকে। দেবতার পায়ে উৎসর্গ করে দেবার মতো হাঁটু মুড়ে বসবে। সাহেব সাদা কামিজ পরবে। পাতার মুকুট পরবে। সাবিনাকেও একটা পাতার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে তখন। নিজেই বুঝবে—কি কুক্ষণে

যে মাথাটা গরম হয়ে গেছিল ! লজ্জায় পড়ে আর এ সব কথায় আসতেই চাইবে না।

আবিন চাচা খুব সহজ গলায় বলল, স্যামসন সাব ডেকে পাঠিয়েছে। ফিরতে সকাল হয়ে যাবে। আমি আছি।

সাবিনার মনটা কেমন এক অজ্ঞাত ভয়ে কেঁপে উঠছে। সে বলল, কেন ডেকেছে !

—ডেকেছে কোনো কাজ টাজ আছে। তোমায় ও নিয়ে ভাবতে হবে না।

—এগুলো কি !

আবিন চাচা মনে মনে ভারি প্রমাদ গুনল, উচিত ছিল সব সাফ করে ফেলা। কি যে হয়, খেলেই ভাতঘুমে শরীর টলমল করতে থাকে। বসে থাকতে পারে না। ঘুমে ঢলে পড়ে।

আবিন চাচা বলল, এগুলো তুলে রাখ।

সাবিনা বলল, কি হয়েছে বলবে তো !

—আরে কিছুই হয় নি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাবিনা দাওয়ায় কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকল। এ দ্বীপেই জন্ম, এখানেই সে বড় হয়েছে, দ্বীপের কার ঘরে কখন স্যামসন সাবের লোকেরা উপদ্রব চালিয়েছে সে কিছুটা জানে। সে কেমন শক্ত গলায় বলল, বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে বল !

—ধরে নিয়ে যাবে কেন ?

—তবে বেঁধে নিয়ে গেছে বল ?

আবিন চাচা এবার উঠে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে বলল, এই ধর তোমাকে যদি সাবের পছন্দ হয়, তবে কি সৌভাগ্যই না বল ! সবার তো হয় না।

সাবিনা সব শুনে কেঁদে ফেলল। বলল, না. না, আমি যাব না দাদু।

আবিন চাচা আর একটা কথা বলতে পারল না। পাশে বসে

থাকল। কেউ শুতে গেল না। খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাপের জন্য জেগে থাকল সাবিনা। দুশ্চিন্তায় কেমন মুখটা নীল হয়ে গেছে তার।

তখন সেই শহরে, আলো-জ্বলা ঘরে, বাংলো বাড়ির কাঠের পাটাতনে সামসের দাঁড়িয়ে। স্যামসন বেশ কামিজ পরে, পাতলুন পরে বাইরে বের হয়ে বলল, খুব রোয়াবী দেখাচ্ছিস।

—না হুজুর, কিছু রোয়াবী দেখাই নি।

—সাবিনাকে সব দেব। কোনো কষ্ট থাকবে না।

—তা জানি।

—তুই তো বুঝদার লোক, কিছু বুঝতে পারিস না? তোর মেয়ের তো রাণী হবার কথা।

সে বলল, তা হুজুর সবাই এটা বলে!

—তবে! ঘাড় কতক্ষণ শক্ত করে রাখবি ভেবেছিস?

সামসের জবাব দিল না।

—জবাব দিচ্ছিস না কেন? কার খাস?

সামসের এবারেও জবাব দিল না।

—কি, বোবা বনে গেলি কেন?

সামসের একবার তাকিয়ে দেখল। ক্ষেপে যাচ্ছে। ভেতরে সেও এক কঠিন শক্ত প্রতিজ্ঞায় টালমাটাল। সাব, তোমার রক্ত চুষে খাব। আমার মা-মরা মেয়েটার গায়ে একবার হাত দিলে তোমাকে হাঙ্গর দিয়ে খাওয়াব। আসলে ভেতরে ভেতরে সামসের নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিল। খুনীর মতো লাগছিল দেখতে।

স্যামসন ভারি সহৃদয় হয়ে উঠল সহসা। বলল, বোস।

কাঠের পাটাতনে লম্বা টুল পাতা। একপাশে কাঠের একটা কারুকাজ করা মেহগিনী কাঠের চেয়ার। গোল ডিমের মতো টেবিল। চারপাশে রেলিং। ছিমছাম বাংলো। বাগানে নানা রকমের ফুলের গাছ। টিউলিপের চাষ করেছে একটা গোল মতো জায়গায়। পর

পর সব ব্যারাক বাড়ির মতো রক্ষিতাদের ঘর এবং কিছুটা নেমে গেলে হাঁস মুরগি শূয়োরের খাটাল। একটা বিরাট এলাকা জুড়ে স্যামসনের এই রাজত্ব। কেউ কুর্ণিশ জানিয়ে নেমে গেল নিচে। যারা ওকে ধরে এনেছিল পাশে তারা এখন কেউ নেই। কামারু ওদের নিয়ে নিচে নেমে গেছে। সদর দেউড়ি পার হতে গেলেই ওদের অড্ডাখানা। পিপে ভর্তি মদ। খাও, যত খুশি খাও।

ডায়নামোর ভট ভট শব্দটা একনাগাড়ে ক্রমে যেন বড় বেশি তীব্র হয়ে উঠছে। এবং আস্তাবলে ঘোড়াটা দেখা যাচ্ছে। সবটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। কেবল মুখটা। সামসের বসল না। দাঁড়িয়েই থাকল।

স্যামসন ভীষণ চতুর লোক—সে আর ঘাঁটাল না। শুধু বলল, যা। ভেবে দেখিস! খুব একটা খারাপ লোক না আমি।

সামসের নেমে যাবার সময় বলল, ছু'দিন সময় দিলাম। ছু'দিন ভেবে দেখবার পক্ষে খুব একটা কম সময় না।

নালিশ সে আর কাকে জানাবে! ওর চোখ ফেটে জল আসছিল। শেষ পর্যন্ত কি হবে সে জানে। ছু'দিন, ছু'মাস, ছু'বছর—তারপর একদিন ঠিক স্যামসন প্রভুর মতো বলবে, অনেক তো জল ঘোলা করলি এবারে একটু পলি পড়তে দে।

নিচে নামতেই আবার চিৎকার শোনা গেল স্যামসনের। সে চিৎকার করে বলছে, ইলাদ, ছকুন, ওকে সাঁকো পার করে দিয়ে এস।

কামারু গুড়ি মেরে বের হয়ে এল তখন। বেশ নেশা হয়েছে তার। টলছে। বলল, সামসের, কাজ কাম হয়ে গেল?

সামসের ঠাণ্ডা গলায় বলল, হ্যাঁ হয়ে গেল। আর তখনই সে দেখল, কামারুর আটগণ্ডা বেড়াল পায়ে পায়ে তার ঘুর ঘুর করছে। সামসের বেড়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

কামারু বলল, তোর মাছের পাওনাটা নিয়ে যা!

সামসের হাঁটতে থাকল। কথা বলল না।

—কিরে, পাওনা পয়সা কে না নেয় ?

সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে গেল সামসের। চিৎকার করে বলল, তুই একটা শূয়োরের বাচ্চা কামারু।

কামারু ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকল। তারপর টেনে টেনে বলল, ভালো ভালো ! পাওনা মিটিয়ে দিতে চাইলে যদি শূয়োরের বাচ্চা হওয়া যায় মন্দ না। ইলাদ, ছকুনের দিকে তাকিয়ে বলল, কি বুঝছ ?

ইলাদ, ছকুনের চোখ মুখ পাথরের মতো শক্ত। কোনো কিছুতেই বিকার নেই যেন। ওরা হ্যাঁ বা হুঁ কিছুই বলল না !

সামসের হাঁটু গেড়ে বসে তখন একটা বেড়াল ধরে ফেলল। তারপর প্রাণপণে সে পাশের পাথরটায় ছুঁড়ে মারল।

—কিরে, পাগলা হয়ে গেলি !

আশ্চর্য ! বেড়ালটা ঠিক পাথরের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর লাফ মেরে নিচে নেমে সাত গণ্ডা তিনটে বেড়ালের সঙ্গে অক্ষত অবস্থায় মিশে গেল।

বেড়ালগুলো কামারুর পায়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে, ছকুন, ইলাদ আর এই আট গণ্ডা বেড়াল সাঁকো পর্যন্ত হেঁটে যাবে ! রাত গভীর। শতেক মানুষের ছোট্ট শহরটা ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেল ! মাঝে মাঝে বেড়ালগুলো মিউ মিউ করে ডাকছে। পাশের পাহাড়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, গভীর নিশীথে অন্ধকার পথে শুধু সামান্য নক্ষত্রের আলো। আর একটু বাদেই কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠে আসবে সমুদ্রে। তখন দ্বীপটায় ছায়া ছায়া এক ভূতুড়ে আলো উপত্যকা থেকে উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়বে। সাঁকো পর্যন্ত হেঁটে এল ওরা। টের পেল, চাঁদ উঠে গেছে। এখান থেকে ওরা বিদায় জানাবে। সোজা রাস্তা নেই বলে, ঘুরে ঘুরে ইউকনের বনের ভেতরে পরিচিত রাস্তায় সে উঠে যেতে থাকল। এখন সে একা। বনটা পার হতে অনেকটা সময় লাগবে। সে কেমন দুঃখী মানুষের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকল। নিষ্ফল আক্রোশে সে মাথা কুটে মরছে।

স্যামসনের সঙ্গে সব সময় বন্দুক থাকে। ছকুন, ইলাদ থাকে। জল্লাদের মতো চেহারা তু'জনের। তার হয়ে কেউ লড়বে না। দ্বীপের শুভাশুভ ভাবলে মানুষটার স্বেচ্ছাচারিতা আর বেশি দিন কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারে না। বালিকা সাবিনার পাণ্ডুর মুখটা সে দেখল আকাশে চাঁদের মতো ঝুলছে, বাবা, আমার কি দোষ বল। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা। পায়ে পড়ি, তুমি আমার বাবা, তুমি না দেখলে কে দেখবে।

সামসের বনের বাইরে আসতেই মাথার ওপরে টিলাতে গীর্জার চূড়ো দেখতে পেল। আর তখনই সে বলল, যীশুরাজ, আমাকে তুমি সাহস দাও। এবং হাঁটু গেড়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতে গিয়ে দেখল, তু'চোখ বেয়ে তার দরদর করে জল গড়াচ্ছে।

॥ সাত ॥

সকাল থেকেই আকাশটা ঘোলা ঘোলা। প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হতে পারে তুপুরের দিকে। কাপ্তান ব্রীজ থেকে নেমে চিফ-অফিসারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। প্রবল বর্ষণ শুরু হলে মাল বোঝাই করা যাবে না। তুপুর নাগাদ যতটা কাজ সেরে রাখা যায়। সেকেণ্ড-মেট, থার্ড-মেট দৌড়াদৌড়ি লাগিয়েছে! ডেরিকগুলো মাল তুলে নিচ্ছে গাদা বোট থেকে। বড় বড় সব তামার পিপে। পিপে ভর্তি ফসফেট। তিনটে হ্যাচে তিনটে ডেরিক যতটা পারছে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। জাহাজ না থাকলে জেটিটা থাকে শান্ত। তু'একজন দ্বীপবাসী তখন ছিপ হাতে চুপচাপ বসে রোদে মাথায় টুপি পরে মাছ ধরে, মানুষজন এদিকটায় একদম তখন দেখাই যায় না। তিনটে ক্রেন চলছে। ক্রেনে পিপেগুলো ভর্তি হয়ে গাদা বোটে চলে যাচ্ছে। সরিতের কাজ ডেরিকগুলো সচল রাখা। উইনচে ঠিকমতো গ্রিজ দেওয়া। বন্দরে এলে নিচে এঞ্জিনরুমে কাজকর্ম থাকে না প্রায়। সে সারাক্ষণ ডেকের ওপর দৌড়াদৌড়ি করছে। একটু ফুরসত পেলেই এসে বসছে

পিছনের বেঞ্চিতে। গ্যালিতে ভাণ্ডারী চাচার মাংসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আর দূরে টিলার ওপর সব ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, মানুষজন। এবং কোনটা সাবিনাদের বাড়ি সে ঠিক বুঝতে পারছে না। দিনের বেলায় সমুদ্র থেকে মনে হয় খুব কাছাকাছি সব বাড়ি ঘরগুলো, কিন্তু দ্বীপে উঠে গেলে দেখা যায় যতটা কাছাকাছি মনে হয়, আসলে তা আদৌ নয়। সে ফিরে আসার সময় হুটো আলোর মধ্যে কোনটা সাবিনাদের ঠিক ঠিক মনে রেখেছে। ঘুম ভালো হয় নি। ভোর রাতে উঠেও দেখেছিল, আলো হুটো ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু সকালবেলায় আলো না থাকায় কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতেই পারছে না, সাবিনাদের বাড়িটা কোন টিলায় আছে।

ঠিক হুপুরে সত্যি প্রবল বারিপাত আরম্ভ হয়ে গেল। ডেক-খালাসীরা ছোটাছুটি করে হ্যাচের মুখটা কাঠ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দেওয়ার পর ওরা ভিজতে ভিজতে চলে এল সবাই। ফোকসালের সব পোর্টহোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিচে আলো জ্বালানো সব ফোকসালে। প্রবল বৃষ্টিপাতে সরিতের চোখের ওপর নিমেষে পৃথিবীটা ধূসর হয়ে গেল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিকেলে সে নেমে যাবে বন্দরে। কারো কাছে কাঁচের চুড়ি যদি থাকে বিক্রির জন্য—জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছে, আগেই বিক্রি হয়ে গেছে সব। তবু টিণ্ডাল বলেছে, কেন সরিত, তোমার কি খুব দরকার?

সে বলল, টিণ্ডাল সাব, খুবই দরকার।

টিণ্ডাল সাব সরিতের কাছে নানাভাবে ঋণী ভাবে নিজেকে। সরিতের মতো বিশ্বস্ত মানুষ সত্যি সে দেখে নি। বিবির কাছে যত চিঠি সব সরিতই লিখে দেয় তার হয়ে। সরিতের কোনো কাজে আসতে পারলে কিছুটা নিজেকে হালকা লাগে।

সরিত বলল, খুবই দরকার। আগে যদি জানতাম।

—আমি তো এনেছিলাম। তবে ওতো ওসানিকাতে সব ঝেড়ে দিয়েছি।

—সব !

—সব বলি কি করে। দু'জোড়া আছে। ভারি পছন্দ। হংকং-এর ঘাটে খুব সস্তায় পাওয়া গেছিল। বেশি দামে বিক্রি করা যেত···

—কত দামে।

—সে যে কি দাম সরিত ! তা তোমার কি দরকার পড়ে গেল এত !

—আর বল না ! জন সামসের বার বার বলেছে, কাঁচের চুড়ি যদি ভালো থাকে····

—ওতো কাঁচের নয়। রূপোর। মিনে করা। একটা মাতাল জাহাজী মদের পয়সা কম পড়লে বিক্রি করে দিয়েছিল।

—তোমার খুব দরকার ও জোড়া ? যা দাম হয় না হয় দিতাম।

—বিবির জন্য রেখে দিয়েছিলাম···দেশে যাব, ঘাটে ঘাটে যা সুন্দর লাগে কিনে তুলে রাখি। বিবি তো গেলেই পেটির কোথায় কি আছে লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ে।

—তা হলে থাক।

—থাকবে কেন। নাও না। আমি তো তোমাকে কিছুই দিতে পারি না। দু' জোড়ার এক জোড়া অনায়াসে আমি তোমাকে দিতে পারি।

সরিত বাংকে বসে ছিল। টিণ্ডাল সাব ফোকসালের দরজায় দাঁড়িয়ে। কথোপকথনে দু'জনই ভারি আন্তরিক। টিণ্ডাল সাব বলেছিল, দ্বীপে কার হাতে তুমি বালা পরাবে ? সে কি খুব সুন্দর দেখতে ! সুন্দর না হলে বালা জোড়ার ইজ্জত থাকবে না।

সরিতের মুখ লজ্জায় সামান্য রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

টিণ্ডাল সাব বলল, জাহাজীদের এইটে বড় কষ্ট। ঘাটে ঘাটে তাদের ঠিক কেউ না কেউ জুটে যায়।

সরিত বলল, তা না। খুব সরল মেয়েটা। কথাবার্তা শুনলে তোমারও ভালো লেগে যাবে।

টিণ্ডাল সাব বলল, ছুনিয়াতে কোন ফকির দরবেশ সাধু সন্ত আছে যার মেয়েদের সুন্দর মুখ ভালো লাগে না।

সরিত বলল, দেখবে?

—এস না।

বাইরে তেমনি ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে। অবিশ্রান্ত। সরিতের মনে মনে ছুশ্চিন্তা। বৃষ্টি ধরে না এলে বিকেলের দিকে জেটিতে নেমে যেতে পারবে না। খুব আশায় থাকবে। লেবু তুলে রাখবে তার জন্যে। সে বলবে, বালা ছুটোর পয়সা, দিতে হবে না। লেবু কটাতো দিলে। জাহাজে তাজা লেবু বেশি দামেও পাওয়া যায় না।

নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথনের সময় মনে হল, টিণ্ডাল সাব দরজায় দাঁড়িয়ে নেই। বোধহয় আনতে গেছে বালা ছুটো। এবং যখন টিণ্ডাল সাব এল, ছু'জোড়াই নিয়ে এল। কোনটা নেবে বল?

সরিত বলল, তুমি যে জোড়া দেবে।

—তুমি পছন্দ করে নাও না।

ছু'জোড়াই বেশ সুন্দর। মিনে করা ওপরে। ফুল, লতা-পাতা, হাতি, খরগোশ আঁকা একটাতে। আর অন্যটায় মুরগি হাঁস কবুতরের ছবি। ভারি চাকচিক্য আছে। খুবই উজ্জ্বল। সাবিনাকে কোনটা মানাবে? ওর হাতে শ্যামলা ঘাসের মতো রঙ, মুখে সবুজ গন্ধ, আর শরীরে পুষ্ট বন্যলতার ছাপ। সে বলল, হাঁস মুরগি ছবি আঁকা জোড়াই দাও। বেশ মানাবে ওকে।

বিকেলে সত্যি বৃষ্টি ধরে এল। বেশ গরম পড়েছে ক'দিন। বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা তাজা একটা ভাব। দ্বীপটা গরমে ছটফট করছিল। বৃষ্টি হওয়ায় সামান্য ঠাণ্ডা জলে দ্বীপটা বেশ নেয়ে নিল। নানারকমের অপরিচিত গাছ, কিছু পরিচিত গাছ-গাছালিও আছে। ঝোপ-জঙ্গলে মাঝে মাঝে পাতিলেবুর জঙ্গল। কেউ কেউ জাহাজ থেকে নেমে গেল, খুঁজে পেতে কিছু লেবু সংগ্রহ করবে ঝোপ থেকে। তার ও-সব দায় নেই। সে বেশ সুন্দর নীল রঙের ট্রাউজার পরেছে। সু-বাদামী

রঙের। গলার টাই সোনালী রঙের। মাঝখানটায় জলছাপের মতো একটা ময়ূরের ছবি। গতকালের মতো পাজামা পাতলুন পরে নি। গতকাল লাভ-লোকসানের একটা দায় ছিল। আজ সে তা থেকেও মুক্ত। খাঁড়িতে ঢুকেই সে জেটিতে লাফিয়ে উঠে গেল। একটা হিন্দি গান শিস দিয়ে গাইছিল। কিছুটা রাস্তা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসতে হয়। তারপরই অনেকগুলো রাস্তা শাখা-প্রশাখার মতো বের হয়ে গেছে। কোনটা দিয়ে উঠে গেলে জন সামসেরের বাড়ি সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

কাছাকাছি কেউ নেই যে কিছু জিজ্ঞাসা করবে। বড় দূরে দূরে সব বাড়ি ঘর। ও-পাশের একটা পাথরের আড়ালে সে তখন কাঠ কাটার শব্দ পেল। সরিত পাশের পাথরটাতে উঠে দাঁড়ালে দেখতে পেল, প্রায়-উলঙ্গ একটা বুড়ি কাঠ কেটে আঁটির মতো করে রাখছে। সে ডাকল, শুনছ!

হাতের কাটারিটা রেখে কানে হাত রাখল বুড়ি। বোধহয় কানে কম শোনে।

সরিত বলল, জন সামসেরের বাড়িটা কোন দিকে?

কিছু ডালপালা সরিয়ে বুড়িটা আরও এগিয়ে এল।

সরিত ফের বলল, জন সামসেরের বাড়ি যাব কি করে?

এমন একটা জায়গায় ওরা দাঁড়িয়ে আছে যে চারপাশের কিছুই দেখা যায় না। রাস্তাটা কেমন অপরিচিতই মনে হল। তবে রাতের অন্ধকারে সাবিনা কি কি ভাবে নিয়ে গেছিল জেটিতে সে বুঝতে পারছে না। গতকাল সে আলো দেখে ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছিল। বড় বড় পাথর সব এ-ওর গায়ে হেলে আছে। কখনও স্মৃতিস্তম্ভের মতো মনে হয়। প্রবল কোনো ভূমিকম্পের পর যেমন ধ্বংসাবশেষের চেহারা হয়, প্রায় কিছুটা তার মতো।

বুড়িটা ইশারায় সঙ্গে যেতে বলল। এবং বেশ কিছুটা জঙ্গল ভেঙ্গে গেলে দেখা গেল, অনেক নিচে দু'জন লোক। দ্বীপটাতে

কি কোনো রহস্য আছে! সে দ্বীপের মাথায় মনে হয় উঠে এসেছিল। এবং তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যখন বুড়িটা নিয়ে গেল সে কেমন ভয়ে ভয়ে ছিল। সেই পাথরের পাঁচিলটার কাছে এসে বলল, হুই! এবং সরিত দেখল, নাকের ডগায় একটা বেশ রজ্জুর মতো রাস্তা ঝুলে আছে। তার মনে হল চেনা এবং আবিন চাচার সেই ঠ্যোঙ্গাটা দেখতে পেল। বাড়িতে ঢোকার মুখে কোনো তিমি মাছের চোয়াল টোয়াল দিয়ে একটা সুদর গেটের মতো বানিয়ে রেখেছে আবিন চাচা।

সরিত বলল, আর তোমাকে আসতে হবে না।

সে এবার ঠিক ঠিক চিনে উঠে গেল আবিন চাচার বাড়ি। গাধা দুটো ছাড়া। ঘোড়া দুটো নেই। আবিন চাচাও নেই। দরজা হাট করে খোলা। কালকের মালপত্র নিয়ে বোধহয় বুড়ো বের হয়েছে। দিনের বেলায় জন সামসেরের বাড়িটা খুব দূরে মনে হল না। প্রায় কোনো পাতার কুটিরের মতো লাগছিল দূর থেকে। বড় বড় ইউকন গাছের ছায়ায় ছোট্ট বাড়িটাকে পরীদের আবাস মনে হচ্ছে। গাছপালার অভ্যন্তরে যদিও কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, তবু মনে হচ্ছিল, কেউ নেই। যদি পাশে ঝোপ-জঙ্গলে আবিন চাচা থাকে। সে ডাকল, আবিন দাদু আছ? ও আবিন দাদু।

না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর কি করে, একটু নেমে ঘুরে গেলে ঝিংকি হ্রদ। খুবই ছোট্ট হ্রদ। নীল জল, পাড়ে পাড়ে সব গাছপালা ভীষণ ঝুঁকে আছে। ছোট ছোট একজাতীয় সাদা রঙের বাঁদর লাফালাফি করছিল ডালপালায়, কিছু পাখি জলে সাঁতার কাটছিল, যদিও এ-সব দেখার সময় নেই, সোজা দ্রুত হেঁটে যাবার সময়—কিছু কিছু চোখে এমনিতেই পড়ে গেল।

একটা হ্রদের পারে বাড়িটা। রাতে সে এটাও বুঝতে পারে নি। সাবিনা কখনও একা এই হ্রদে সাঁতার কাটে কি না জিজ্ঞেস করবে ভাবল। এতটা পথের ভেতর আর কোনো বাড়ি নেই। দূরে

একমাত্র আবিন দাদুর বাড়িটা। সাবিনা অনায়াসে পোশাক খুলে হ্রদের নীল জলে সাঁতার কাটতে পারে।

আশ্চর্য! সে বাড়িতে ঢুকে দেখল, এখানেও কেউ নেই। সামসের না থাকলেও সাবিনার থাকার কথা। এখানেও সে দেখল দরজা হাট করে খোলা, যেন এইমাত্র কেউ কোথাও গরু ছাগল নিয়ে উপত্যকায় গেছে, ফিরে এল বলে।

সরিত কিছুক্ষণ আমলকি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর সে দেখল পায়ের কাছে একটা কচ্ছপ গলা বাড়িয়ে ওকে দেখছে। সে আঁৎকে উঠেছিল। যেন ধীরে ধীরে একটা সরীসৃপের গলা তাকে কামড়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসছিল। সে দূরে লাফিয়ে পড়ে দেখল, নিরীহ অতিকায় একটা সামুদ্রিক কচ্ছপ। পা দুটো করে লতা দিয়ে বেঁধে ফেলে রেখেছে কেউ। আর কিছু নেই। করমর্াঁত পাখিটাও নেই। গরুটার না থাকারই কথা। মানগানু উপত্যকায় হয়তো চরতে গেছে। সে ডাকল, সাবিনা!

উপত্যকায় কোথাও কোনো পাখির কর্কশ গলা পাওয়া গেল।

কচ্ছপটা ওকে দেখছে। ঘাড় কাত করে দেখছে। এত নিরিবিলি আর বনের গভীরে সাবিনাদের খোলামেলা আস্তানায় শুধু অতিকায় কচ্ছপটা ঘাড় কাত করে দেখছে। কাছাকাছি 'জীবন্ত বলতে আর কিছু নেই। মুরগিগুলোও নেই। কিছু আমলকি ফল ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বরণডালার পিটুলির পোড়া প্রদীপ দরজার কাছে জড়ো করা। ভেতরে যদি সাবিনা থাকে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল ঘর ফাঁকা। কাঠের মাচান আছে ভেতরে। কাঠের পেটি আছে ভেতরে। বন্যলতায় তৈরি বোধ হয় পাখি ধরার অথবা মাছ ধরার জাল একটা পড়ে আছে মাচানের নিচে। কিছু মাটির পাত্র। উবু করা একটা উদখল। সে বাইরে বের হয়ে উপত্যকার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকল, সা···বি···না।

না, কোনো সাড়া শব্দ নেই। খুঁটিতে একটা ঝোলা দেখতে

পেল। কিছু লেবু সংগ্রহ করে রেখেছিল সাবিনা। কচ্ছপটা ঘাড় কাত করে তখনও ওকে দেখে যাচ্ছে।

সাবিনা কি শুধু কচ্ছপটাকে পাহারায় রেখে বাড়ি ছেড়ে গেছে! কচ্ছপের চোখ দুটো সত্যি ভারি মায়াবী দেখাচ্ছিল। ওর বন্দী থাকাটা সরিতের খুব খারাপ লাগছিল। ছেড়ে দিলে কেমন হয়। এবং কেমন ওকে এক ধরনের জেদে পেয়ে বসল। ইয়ার্কি! কত আশা করে আসা! কত ভাবে সে সংগ্রহ করেছে একজোড়া মিনে করা রূপোর বালা। কত কিছু যে ভেবে এসেছে। আর ঠাট্টার মতো একটা জ্যান্ত কচ্ছপ উঠোনে বেঁধে রেখে সবাই হাওয়া। দাঁড়াও মজাটা দেখাচ্ছি। এই না ভেবে, সে কচ্ছপের পায়ের লতা তার ছোট্ট জাহাজী ছুরিটা দিয়ে ক্যাচাং করে কেটে দিল। আর দিতেই কচ্ছপটা গুটি গুটি হাঁটতে থাকল।

সরিত কি ভেবে কচ্ছপটার পিছু নিল। কোথায় যায় দেখা যাক। সমুদ্রে যায়, না, হ্রদে গিয়ে নামে। সমুদ্রে যেতে ওর হয়তো এখন বিকেল আর রাতটাই কেটে যাবে। সরিত কিছুক্ষণ পিছু পিছু হেঁটে চলল। ওটা একটা বড় ঝোপের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। বেশ কিছুটা পথ এসে ঝিংকি হ্রদে নেমে যেতে পারত। তা না করে উল্টো দিকে চলে গেল। এবং তখনই মনে হল দুটো পাথরের মাঝে মুখ গুঁজে সাবিনা বসে আছে।

সে দ্রুত দৌড়ে গেল। বলল, এই সাবিনা, তোমরা তো বেশ। বাড়ি ছেড়ে সবাই উধাও।

সাবিনা সরিতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি দেখল। তারপর ফের মাথা গুঁজে দিল।

সরিত বলল, এই মেয়ে, কি হয়েছে তোমার!

সাবিনা ভারি গম্ভীর করে ফেলল মুখ। বলল, তুমি আর এস না ভিনদেশী।

—কেন কি হয়েছে!

—এলে তোমার অনিষ্ট হবে।

—ধুস। বলে সে সোজা পাশে বসে পড়ল।

লম্বা গাউনে সাবিনার পায়ের পাতা ঢাকা। এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। ভারি দুঃখী মুখ। ওর দিকে তাকাচ্ছেই না। যেন ওকে সাবিনা চেনে না। করমর্ঁাত পাখিটা কোত্থেকে উড়ে এসে সাবিনার মাথায় বসে পড়ল। এতেও মেয়েটার কোনো ভাবান্তর নেই। কি যে এত ভাবছে, সে বুঝতে পারছে না।

সরিত বলল, কি বৃষ্টি হয়ে গেল! আমি তো ভাবলাম আর আসাই গেল না।

সাবিনা হাঁটুতে চিবুক রেখে নরম ঘাস ছিঁড়ছে। কোনো কথা বলছে না তবু।

সরিত বলল, পাখিটা মাথায় বসে থাকলে তোমাকে বেশ দেখায়।

সাবিনার চোখ ফেটে দু' ফোঁটা জল ঘাসে গড়িয়ে পড়ল তখন।

সরিত বলল, এই তোমার কি হয়েছে? কাঁদছ কেন?

সাবিনা হেসে দিল। —কোথায় কাঁদলাম! বলে উঠে দাঁড়াল। সরিতের দিকে না তাকিয়ে চারপাশটা সন্তর্পণে দেখল। কেমন একটা ভয় ভয় মুখ। তারপর বলল, ভিনদেশী, আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

—এস না। বলে প্রায় ওকে টানতে টানতে আশ্চর্য সব গভীর বনজঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। কিছুটা যেন ভয় থেকে রেহাই পাওয়ার মতো। এবং কিছুটা হেঁটে এসেই সরিত বুঝতে পারল ওরা সমুদ্রের ধারে চলে এসেছে। বিরাট একটা পাথরের চাতাল, ঠাণ্ডা প্রপাতের জল সমুদ্রে খাড়া পড়ছে।

জায়গাটা ভারি সুন্দর। দূরে দূরে সব দ্বীপের ইউকনের গভীর বনজঙ্গল। সূর্য হেলে গেছে সমুদ্রে। জলরঙের মতো সারা আকাশ। দিগন্তব্যাপী সমুদ্র অসীমে মিশে গেছে। আর মাঝে মাঝে উঠে আসছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি। কোথাও সমুদ্রের গভীরে সাদা ঢেউ ছুটে

আসছে। আর ঝড়ো হাওয়ার মতো বাতাস বইছে শন শন করে। বনের গভীরে বাতাস ঢুকে সব গাছপালা তছনছ করে দিচ্ছে।

সরিত বলল, সাবিনা, তোমার বাবা বাড়ি নেই কেন? আবিন দাছুকে দেখলাম বাড়ি নেই।

—ওরা রংকিতে গেছে।

—রংকি!

—যীশুরাজের পরই এ দ্বীপে আমরা যাকে ভয় পাই তার নাম রংকির রাজা। ওর উনিশটা বউ আছে।

—উনিশটা বউ!

—হ্যাঁ। আমাকে নিয়ে এবার ওর বিশটা হবে।

—তা হলে তুমি দ্বীপের রাণী!

—হই নি। হবার কথা চলছে। তোমাকে জাহাজে দিয়ে এসেই বুঝতে পারলাম। কচ্ছপ ভেট পাঠিয়েছে। আরও কত কি!

—রাজা পাঠিয়েছে?

হ্যাঁ। বলে সে দৌড়ে গেল কিছুটা। মনের ভেতরে কিছু ছুঃখ, সবটা মুছে দেওয়া যায় কিভাবে সাবিনা বুঝি তাই ভাবছিল। ভিনদেশীর মুখ খুব ব্যাজার হয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, দেরি হবে।

—দেরি কেন? সরিত বলল।

—বাপ আর দাছু তাই বলতে গেল।

সরিত বলল, কাকে?

—স্যামসন রাজাকে। রাজা ভীষণ লোভী। বোধহয় শুনবে না।

—বা রে! তোমার এমন সৌভাগ্য, দেরি করে লাভ কি?

—আমার তো বৌ হবার বয়স হয়নি!

কি সরল অকপট কথাবার্তা। সরিত আর কিছু বলতে পারল না। সে যে ছুটো রূপোর মিনে করা রুলি এনেছে, এবং সাবিনা পরলে কেমন লাগে ভারি দেখার ইচ্ছে, কিছুই আর বলতে সাহস পেল না। স্যামসন

সাবের কথা সে জাহাজেও শুনেছে। বাবার আমল থেকে দ্বীপটা ইজারা নেওয়া আছে তাদের। দ্বীপে সব দামী ফসফেটের পাহাড় আছে। তাই কেটে কেটে প্রচুর টাকা কামিয়েছে স্যামসনের বাপ। কিন্তু স্যামসন এখানে এসে আর ফিরে যায় নি। দ্বীপটার লোভে পড়ে গিয়ে প্রায় রাজার মতোই বেঁচে আছে।

তখনই মনে হল সেই করমরাঁত পাখিটা টুপ করে মাছরাঙার মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর মিনিট দুই তিনের ভেতর একটা ছোট্ট রূপোলী মাছ ঠোঁটে তুলে নিয়ে এল। ভারি শিকারী পাখি। মাছটা ঠোঁট উঁচু করে গিলে ফেলল পাখিটা। সাবিনা লক্ষ্য করছে না। সরিত পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

সাবিনা বলল, তোমার জন্য লেবু তুলে রেখেছি।

সরিত ওর পাশে দাঁড়িয়েছিল। সমুদ্রের দিকে ওদের মুখ। পেছনে পাথরের চাতালটা কিছুটা দূরে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। তারপর সেই উঁচু সব বনের গাছপালা। নির্জন। এবং কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না।

—তোমার বাবা কাঁচের চুড়ি আনতে বলেছিল।

সাবিনা নিচে নেমে ঠিক সমুদ্রে সামান্য পা ঝুলিয়ে দিল। ঢেউ ভেসে এলে ওর পা ভিজে যাচ্ছে। সাবিনা সত্যি বালিকার মতো উচ্ছল হয়ে উঠল। বলল, এনেছ?

সরিত বলল, কাঁচের চুড়ি পাওয়া গেল না। দেখতো এটা পছন্দ হচ্ছে কি না? বলে, পকেট থেকে রূপোর রুলি জোড়া বের করে দেখাল।

সাবিনা হাতে নিয়ে দেখল। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল। একবার সরিতের দিকে মুখ তুলে দেখল, আবার রুলি জোড়া দেখল।

তারপর সমুদ্র দেখতে দেখতে বলল, ভিনদেশী, আমার পাশে বোস না! তখন করমরাঁত পাখিটা টুপ করে আবার সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। বাতাসে জলকণা ভেসে আসছে। সে পাশে বসে পড়ল।

বাদামী রঙের সু জোড়া খুলে পাশে দিল রেখে। মোজা খুলে সেও সাবিনার মতো পা ঝুলিয়ে দিল। বাতাসে জলকণা ভেসে এসে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিল তার।

রূপোর এমন চুড়ি সাবিনা জীবনেও দেখে নি। দু'হাতে দু'টো পরে ফেলল। তারপর হাত ঘুরিয়ে দেখল। কখনও হাত দু'টো ছড়িয়ে দিয়ে, কখনও বুকের কাছে রেখে, কখনও ঝুলিয়ে দিয়ে সে ঘুরে ফিরে তার শরীরের সৌন্দর্য অনুভব করল। চুড়ি দু'টো পরায় তাকে কি যে ভালো দেখাচ্ছে—সে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না, উপত্যকায় ছুটে গিয়ে তার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। এবং সহসা সে ভিনদেশীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাথরের মসৃণ চাতালে, তার হাত ধরে নাহারু গান ধরে দিল। সরিত গানের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না। তবু কেমন এক আশ্চর্য ছন্দ আছে, আর এমন নিরিবিলি পাহাড়ী উপত্যকাতে সে পা মেলাতে থাকল সাবিনার সঙ্গে। পাখিটা তখন তাদের মাথার ওপর ডিগবাজী খাচ্ছে। উড়ছে। সে বাতাসে পাখা দুলিয়ে নাচছে বোঝা যাচ্ছিল।

এবং ক্রমে এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিছু নক্ষত্র জেগে উঠল দিগন্তে, সমুদ্রের মাথায়, পাহাড়ের ওপর। নিশীথে সাবিনার সঙ্গে ফিরে আসার সময় সরিতের মনে হল, পাহাড়ী উপত্যকায় ওভাবে সে কখনও ফুল ফুটে থাকতে দেখে নি! তার এই জীবনে কত রকমের অভিজ্ঞতার সে সাক্ষী। কিন্তু এমন একটা বিষণ্ণ ভালোবাসা সে জীবনেও টের পায় নি।

যেতে যেতে সাবিনা বলল, ভিনদেশী, আমি যদি মরে যাই দুঃখ পাবে না তুমি!

সরিত বলল, কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে!

—বাপ সময় চেয়ে আনছে। আজ হোক দু'বছর পরে হোক, বুড়ো রাজা আমাকে নিয়ে যাবে। পাতার মুকুট পরাবে। ডাবের জল দিয়ে স্নান করিয়ে নেবে। শরীরের সব পবিত্রতা তারপর সে নষ্ট করে দিলেই আমি মরে যাব ভিনদেশী।

ভিনদেশীর চোখ তখন কেমন ঝাপসা হয়ে উঠছে। তরুণী সাবিনা, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যুবতী হয়ে যাবে। সে বলল, মরে যাবার সময় আমার কথা মনে রেখ সাবিনা। আর কিছু আমি চাই না।

॥ আট ॥

রংকিতে পৌঁছাতে আবিন চাচা এবং সামসেরের বেলা হেলে গিয়েছিল। সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠে যেতে হয়। দেউড়ির নিচে সেই দুই প্রবল দৈত্যের মতো মানুষ দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারছে, জন সামসের হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থী। ইলাদ বড় বড় লম্বা আঁশের পাট দিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল। একটা চরকির মতো কাঠের পাটা, ঘুরিয়ে দিলেই আঁশগুলো প্যাঁচ খেয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন হাতে কোনো কাজ থাকে না, ছকুন, ইলাদের এ-সব কাজ থাকে হাতে। লম্বা সব দড়ি থাকে খাদে নেমে যাবার জন্য—হরবকত দরকার লাগে। ওদের বিবিরা খাদে গেছে, এখনও ফিরে আসে নি। ছেলেমেয়েরা কাঠের তেপায়ার ওপর লাফাঝাঁপি করছে। পাথর কুঁদে কেউ বলের মতো ছোট আকার বানিয়ে ফুটো করার মতলবে আছে। পাথরের মালা, কানে পাথরের দুল, মাথায় ঘাসের ফুল পরতে ওরা ভালোবাসে। এবং কোমরে তোয়ালে প্যাঁচানো, ব্লাউজের মতো জামা গায়। ওরাও টের পেয়েছে, লোক দুটো বিকেল থেকে বেড়ার পাশে বসে আছে কেন। বাপ জ্যাঠারা খুব আদর যত্ন করছে। ডাবের মিষ্টি জল, শংখি ফুলের নাড়ু এবং মিষ্টি আলুর পায়েস দিয়েছে খেতে। বাপ জ্যাঠারা হাতের কাজ ফেলে ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

সূর্য অস্ত যেতেই পাহাড়ের মাথায় ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। স্যামসন সাহেব সব দেখে শুনে আস্তানায় ফিরে আসছে। উনিশ নম্বর কুটিরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বাকী সব কুটিরে তত ব্যস্ততা নেই। বিশ নম্বর কুটির তৈরি হচ্ছে রংকি পাহাড়ের ঢালুদেশে। ওটা হয়ে গেলে আবার কেউ আসবে। তখন ঘোড়ার

খুরের শব্দ আর তেমন কোনো স্পন্দন তুলবে না উনিশ নম্বর কুটিরে। ঠিক আর আঠারোজনের মতো নিবু নিবু আলো জ্বলবে শুধু। পরিত্যক্ত আবাসভূমির ভেতর ওরা পুরনো জরাজীর্ণ দর্পণের সামনে নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে কাল কাটাবে। চুরিচামারি করে কেউ কেউ এই বন্দীদশা থেকে কখনও খুঁজবে মুক্তিলাভের উপায়। কিন্তু দেখা গেছে—কেউ বেশিদূর যেতে পারে নি। মৃতদেহ জোড়ায় ভেসে গেছে সমুদ্রে। হাঙ্গরগুলো ধেয়ে এসেছে রক্তের গন্ধে। এমন সব করুণ ইতিহাস দ্বীপটাতে বার বারই ঘটে যায়!

যখন স্যামসন সাহেব পোশাক পাল্টে নিচে নেমে এল—তখন রাস্তায় আলো, ঘরে ঘরে উপত্যকার গভীরে সব আলো। এবং প্রায় সম্রাটের কায়দায় অভিবাদন গ্রহণ করে বেতের নরম চেয়ারে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসলে, আবিন চাচা তার আর্জি পেশ করল। এক নম্বর আর্জি—কিছু সময় চেয়ে নেওয়া। আবিন চাচা বলল, হুজুর বছরখানেক সময় চাইছি। তখন সাবিনারও কোনো অসুবিধা থাকবে না। যুবতী হয়ে উঠবে। আপনারও খুব সুবিধে হবে তখন।

কথাটার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল প্রৌঢ় স্যামসনের। সে চোখ বুঁজে পাইপের ডগা মুখে রেখে যেন ঝিমুচ্ছিল। কিছুই শুনতে পাচ্ছে কিনা কে জানে। আবিন চাচার ভয় ধরে গেল। গতকাল গোঁয়ার সামসেরের ব্যবহারে তিনি এখনও ক্ষুব্ধ বুঝি; রাস্তায় আসার সময় বার বার বুঝিয়েছে, মাথা গরম করবি না! মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই সামসের। বরং সাবিনাকে দিয়ে তুই আরও কিছু বেশি সুবিধা চেয়ে নে। ওটাই বুদ্ধিমানের কাজ!

সামসের মাথা নিচু করে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। আর ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো স্যামসন বললে, সামসের কি বলে!

আবিন চাচা সামসেরকে গুঁতো মেরে বলল, এই, কি বলছে হুজুর! কিছুটা সুবিধা সে এবার আদায় করে নিতে পারে। সে বলল, হুজুর! আমার তো একটাই আর্জি।

স্যামসন চোখ বুঁজে শরীর এলিয়ে দিল। একটু দূরে ভারি সজাগ সেই যমদূত-প্রায় মানুষ দু'জন। ওরা অবশ্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, হুজুর আমার তো একটাই আর্জি।

কেমন বিরক্ত মুখে স্যামসন বলল, আর্জিটা কি?

—হুজুর, কামারুর কাছে সতেরোটা শিলিং পাব।

—দিচ্ছে না?

—চাইলেই দেবে। তবে চাইছি না।

—চাও তাহলে।

—কিন্তু হুজুর, ওর আটগণ্ডা বেড়াল যদি…

—আটগণ্ডা বেড়াল দিয়ে কি হবে?

—মেয়েটা চলে আসবে। বেড়ালগুলো নিয়ে থাকব। কিছু হুজুর কাছে রাখতে হয় মানুষকে। মানুষ তো একা থাকতে পারে না।

আবিন চাচার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। কথার ধরন-ধারণ খুব একটা ভালো লাগছে না। সে বলল, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সামসের।

সামসের খুব স্থির অথচ কাতর গলায় বলল, বেড়ালগুলো না হলে চলবে না হুজুর। খুব একা হয়ে যাব।

—তা সামান্য ব্যাপার। কামারুকে বলে দেব।

—হুজুর, যাবার সময় তবে নিয়ে যাই।

সামসেরটা কি আহাম্মক। এটুকু সুবিধে চেয়ে নেওয়া! কি যে বলবে আবিন চাচা। সে বলল, তোর আর কিছু চাইবার নেই?

স্যামসন সাহেব দুটো আর্জিই মঞ্জুর করে দিল। বলল, ঠিক আছে। সামসেরের মেয়ে বড় হলে, জানিও। আর যাবার সময় বেড়াল চেয়ে নেবে কেন? ডেকে এক্ষুণি বলে দিচ্ছি বেড়ালগুলো দিয়ে যাক কামারু।

আবিন চাচা ম্যাদা মেরে গেল। সামসেরের আহম্মকির জন্য মনে মনে আফশোষ হচ্ছিল। সে অনায়াসে মানগামু উপত্যকার কিছুটা অংশে ভাগ বসাতে পারত। সে ইচ্ছে করলেই দু' শিলিং করে কাজ

না করেও পেতে পারত। বাড়ি-ঘর ঠিকঠাক করে নিতে পারত। এত কিছু করার ছিল সামসেরের। আহম্মকটা কিছুই চেয়ে নিল না। মনে মনে এত আফশোষ হচ্ছে যে একটা কথাও আর বলতে ইচ্ছে হল না তার।

কামারু তলব পেয়ে বিড়াল নিয়ে হাজির। ওর পায়ে পায়ে বেড়ালগুলো পোষা জীবের মতোই ঘুর ঘুর করছে। এভাবে সামসের প্রতিশোধ নেবে ওর ওপর সে স্বপ্নেও ভাবে নি। ওর সন্তানের মতোই সবাই। সে কিছুক্ষণ সাহেবের পায়ের কাছে বসে হাউ হাউ করে কাঁদল। কিন্তু সামসের কান্নায় এতটুকু টলল না। সাহেব কান্না-কাটি একদম পছন্দ করে না বলে উঠে চলে গেল।

এখন সামসেরের সব চেয়ে বড় বিভ্রাট এতগুলো বেড়াল একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া। বাড়িতে নিয়ে তুলতে পারলে দেখা যাবে। দরকার হয় সে আর সাবিনা বাইরে রাত কাটাবে। বেড়ালগুলো থাকবে ঘরে। শেকল তুলে দিলে একটাও পালাতে পারবে না।

সামসের বলল, কামারু, একটা কাজ করতে হয়।

কামারু চোখ জামার খুঁটে মুছে বলল, বল।

—এগুলো দিয়ে আয়। আমাকে তো আর মানবে না।

অন্য সময় কামারু এটা ওটা হুকুম করত সামসেরকে। সেই সামসেরকে বেশ কায়দায় ফেলে এখন লাথি কষাচ্ছে। সাহেবের শ্বশুর হতে যাচ্ছে, যা খুশি বলবে। তারও বশংবদের মতো হুকুম তামিল না করে উপায় নেই। অগত্যা কি করে! সে সামসের পিছু পিছু বেড়ালগুলো নিয়ে হেঁটে চলল। কামারুর বৌ খবর পায় নি। পেলে সেও মরাকান্না জুড়ে দিত। এবং কামারু প্রায় গোপনে যখন তুলে নিয়ে এল বেড়ালগুলোকে তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। সাবিনা বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছে। বাপের আসতে দেরি দেখে কিছুক্ষণ খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে ছিল, কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে ছিল দূরের জাহাজটার দিকে। তারপর চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠলে আর বসে থাকতে পারে নি। বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সামসের বলল, তোর বেড়াল কি খায় রে?

রাগের মাথায় কামারু বলল, সব খায়।

—ভালোই হল। বলে সে ডাকল, সাবিনা, দেখ কি এনেছি!

সাবিনা ঘুম থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসেছিল। বাপ না জানি কি খবর নিয়ে এসেছে। বাপের গলায় ভারি সোহাগের কথাবার্তা। প্রথম তো সে ভেবেছিল, বোধহয় জাহাজ থেকে ভিনদেশীকেই পাকড়াও করে এনেছে। তার কাছে এর চেয়ে আনন্দের আর কোনো খবর নেই, কিন্তু যখন দেখল, সেই আটগণ্ডা বেড়াল আর কামারু উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে—ভয়ে কেমন সিটিয়ে গেল। অবাক এবং অধীর গলায় ডাকল, বাবা।

—ভয় নেই। এরা কিছু করবে না। ঘরে মাছটাছ কি আছে বের কর।

সাবিনা বলল, কিছু তো নেই।

সামসের বলল, তুমি ভেতরে যাও। বেড়ালগুলো তবে ঘরে ঢুকে যাবে।

আগেই দরজা জানালা বন্ধ করে নিয়েছে সামসের। আবিন চাচার মনে হয়েছিল, মাথাটা একেবারেই গেছে। পাগল হতে আর বাকি নেই। বেড়ালগুলো ঘরে ঢুকলে প্রায় কামারুকে ঠেলে বের করে দিল সামসের। তারপর দরজায় শেকল তুলে দিলে আবিন চাচার চোখ জলে ভারি হয়ে গেল। আসলে সামসেরের মাথাটাই গেছে। দ্বীপের আর একজন ভালোমানুষ এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে সে আর দাঁড়িয়ে থাকলে পারল না। যাবার সময় সাবিনাকে ডেকে কানে কানে বলল, যদি কিছু গোলমাল করে ডাকিস। গতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না।

সাবিনা বলল, আবিন দাদু, আমার ভয় করছে। চোখ কি লাল! নেশা ভাঙ করেনি তো।

—কখন করবে!

—এমন তো হয় না।

—ঠিক হয়ে যাবে সব। ভাবিস না। কামারুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আর দাঁড়িয়ে কেন, যাও।

কামারু কেমন বিলাপের গলায় বলল, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব সামসের।

সামসের ভীষণ ক্ষিপ্ত গলায় প্রায় গলা টিপে ধরার মতো বলল, সাবধান, এসেছ তো খুন করে ফেলব।

—দেখুন তো চাচা, শুধু শুধু আমার ওপর হুজ্জুতি করছে।

—তুই ছাড়া কে আছে রে, কে সব খবর দেয় জানি না বুঝি! তোর গলার রক্ত চুষে খাব রে ইতর।

আবিন চাচা বলল, মাথা ঠিক নেই কামারু। এখন যা তো। বেড়ালগুলো তখন ভেতরে আঁচড়াচ্ছে, ম্যাঁও ম্যাঁও করছে। দরজা জানালা যেন সব ভেঙ্গে ফেলবে। কামারু দু'একটার বেশি গলা খাঁকারি দিতে পর্যন্ত সাহস পেল না। বেড়ালগুলোর সব কটার অতি প্রিয় সব নাম আছে তার দেওয়া। যাবার সময় সে একবার বলে যাবে, বনবাসে রেখে গেলাম রে পানু, গানু, হানু, ছানু, দীনু, নিনু কত সব এমন প্রিয় নাম তার—কিছুই বলতে পারল না। গভীর রাতে সে শাপশাপান্ত করল মনে মনে। বনের ভেতর লণ্ঠন হাতে ঢুকে যেতেই মনে হল, বাড়ি ফিরে গিয়ে বউটাকে কি বলবে? কি বলে প্রবোধ দেবে!

সারারাত সাবিনা ঘুমোতে পারল না। সারারাত সামসের ঠায় বসে থাকল। সকালে সাবিনা বলল, কিছু মাছ ধরে আনি। খেতে দিলে আর কোথাও যাবে না। যা জ্বালাচ্ছে সারা রাত ধরে।

সামসের গরুটা বের করে দুধ দুয়ে নিল। সবটা দুধ গামলায় রেখে দরজা খুলে দিতেই লাফিয়ে পড়ল আটগণ্ডা বেড়াল। তারপর অর্ধেকটা যেই না খেয়েছে, গামলাটা তুলে ঘরে রেখে বন্ধ করে দিল। এবং উঠোনে সারাদিন বসে বেড়ালগুলোর স্বভাব লক্ষ্য করতে থাকল।

আবিন চাচা সকালেই চলে এসেছে। এবং প্রতিবেশীরাও খবর পেয়ে দেখতে এসেছে। ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে গেল সামসেরকে। সামসের কিছুই দেখছে না, কেবল বেড়ালগুলোর স্বভাব-চরিত্র লক্ষ্য করছে। সে হিসেব করে দেখল আটটা হুলো বেড়াল। আটগণ্ডার ভেতর দু'গণ্ডা। ভীষণ হিংস্র স্বভাব। ঘরের ভেতর দুধ। বেড়াল-গুলো বাইরে। ঘরের চারপাশে আঁচড়ে কামড়ে ভেতরে ঢুকতে চাইছে বাকি দুধটুকু খাবার জন্য। রাতে আঁচড়ে কামড়ে বাইরে বের হতে চেয়েছিল, দিনের বেলায় আঁচড়ে কামড়ে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। দুধের গন্ধে বেড়ালগুলোর মাথা খারাপ হয়েছে।

আবিন চাচা বলল, কিরে! সারাদিন এ-ভাবে বসে থাকলেই চলবে? খাবি-দাবি না?

সামসেরের চোখে সামান্য বিভ্রম দেখা দিল যেন। সে একবার তাকিয়েই দেখল, বুড়ো মতো একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। পরে বুঝতে পারল, খুবই পরিচিত, তারপর মনে পড়ল, দ্বীপের আবিন চাচা। সে আবার বেড়ালগুলোর দিকে মনোযোগ দিল।

আবিন চাচা ফের বলল, মেয়েটা না খেয়ে আছে খবর রাখিস! তুই না খেলে মেয়েটা কিছু মুখে দিতে পারে!

সামসের সহসা যেন স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গেল। সত্যি তো, সে না খেলে সাবিনা খাবে কি করে! সে বলল, সাবিনা, কিছু রেঁধে বেড়ে ফেল। করমরাঁত পাখিটা নিয়ে সে কাঁধে গামছা ফেলে মাছ ধরতে চলে গেল। সাবিনা মিষ্টি আলু সেদ্ধ করল। বাপ মাছ ধরে আনলে, কিছু মাছ বেড়ালগুলোকে দিল, কিছু নিজেদের জন্য চর্বিতে ভেজে খেতে বসে গেল। বেড়ালগুলো আর কোথাও যাবে না, কিছুদিন এভাবে ঘরে বাইরে মাছ-দুধ রেখে দিতে পারলেই পোষ মেনে যাবে। সামসের বিকেলের দিকে একবার হেসে কথাও বলল আবিন চাচার সঙ্গে। সাবিনার মনেও স্বস্তি ফিরে এসেছে আবার।

॥ নয় ॥

বিকেলে সরিত এসে ভীষণ অবাক! বাড়ি ভর্তি শুধু বেড়াল! উঠোনে, বারান্দায়, আমলকি গাছের নিচে, মাথার ওপর ইউকন গাছের ডালে ডালে পোকা-মাকড়ের মতো শুধু বেড়ালগুলো শুয়ে বসে থাবা চাটছে। কোনোটা লেজ গুটিয়ে ঘুমুচ্ছে। সরিতকে দেখেও ঘাবড়ে গেল না। সে বার বার চারপাশটা দেখতে থাকল। ঠিক ঠিক আসতে পেরেছে তো! না অন্য কোথাও সে চলে এল! বেড়ালগুলোর পরিবর্তে সে নিজেই কেমন ঘাবড়ে গেল।

সে বোধহয় ফিরেই যেত, কারণ সে ফিরে যাওয়াই ভেবেছিল বুদ্ধিমানের কাজ। এক-একদিন এক-একরকম হয়ে যাচ্ছে বাড়িটা। গতকাল সে এসে দেখল, কেউ বাড়ি নেই, শুধু বড় একটা কচ্ছপ বাড়িতে রেখে কোথায় ওরা চলে গেছে। কচ্ছপটা এমনভাবে তাকিয়েছিল যে প্রথমে তো মনে হয়েছিল কোনো সরীসৃপ-টিপ হবে। গলাটা লম্বা করে দিয়েছিল। আজ কচ্ছপটা আর নেই। শুধু বেড়াল আর বেড়াল! থাবা চাটতে চাটতে তাকে লক্ষ্য করছে। কি আছে কার মনে কে জানে! সে এতই ভয় পেয়েছিল, বোধহয় দৌড় মারত। তখনই সাবিনার গলা শোনা গেল। ঘরের ভেতর খাটিয়াতে শুয়ে আছে সে। ঘরটা অন্ধকার, আলো খুব একটা ভিতরে ঢুকতে পারে না, জানালা বন্ধ, দরজার এক পাট খোলা, এক পাট ভেজানো। সাবিনার গলার আওয়াজটা ভারি ভূতুড়ে শোনাচ্ছিল।

সরিত ভয়ে ভয়ে তাকাল। বারান্দায় সাবিনা বের হয়ে এসেছে। চোখ ফোলা ফোলা। চুল খোলা। বয়সানুযায়ী বোধহয় সাবিনা খুবই লম্বা। হাঁটু পর্যন্ত একটা সবুজ রঙের ফ্রক। লম্বা পা দুটো শুধু এগিয়ে আসছে।

সরিত কি করবে বুঝতে পারছিল না।

উঠোনে নেমে এলেই সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাবিনাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সাবিনা উঠোনে দাঁড়িয়েই বলল, ও ভিনদেশী! কি হল, চলে যাচ্ছ কেন?

সরিত বলল, বেড়াল!

—কামারু চাচার বেড়াল।

সরিতের মনে পড়ে গেল, একবার যেন কি কথায় সাবিনা তাকে এই আটগণ্ডা বেড়ালের কথা বলেছিল। আটগণ্ডা বেড়াল সত্যি কিনা, সে ভেতরে ঢুকে গুনতে থাকল। শেষ পর্যন্ত সে কিছুতেই মেলাতে পারল না। কখনও সাড়ে সাত গণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, কখনও সাড়ে আট গণ্ডা। ঠিক আটগণ্ডা হচ্ছে না।

সাবিনা বলল, কি হল?

—মিলছে না তো!

—কেন মিলবে না। পালায় নি তো আবার! সে নিজেও সরিতের সঙ্গে গোনার কাজে লেগে গেল। কিন্তু গুনে গুনে সেও মেলাতে পারল না। কখনও সোয়া সাত গণ্ডা হচ্ছে, কখনও সোয়া আট গণ্ডা। তখন ওরা রঙ মিলিয়ে গুনতে বসে গেল। কালো, ধলো, হলুদ-সাদা, হলুদ-কালো, খয়েরি রঙের, হলুদ-খয়েরি রঙের এবং হিসেবটা এক সময় সত্যি সত্যি মিলে যেতেই যেন সরিতের বিশ্বাস জন্মে গেল, এটা একটা সত্যি মানুষের আবাস। সাবিনা রক্তমাংসের মানুষ।

সরিত বলল, এত বেড়াল দিয়ে কি হয়?

—*কি হয় জানি না। বলে সে বারান্দায় একটা জলচৌকি এনে* দিল। সরিত বসে পড়লে বলল, কাল বাবা রংকিতে গিয়েছিল। সঙ্গে আবিন চাচা। ফেরার সময় কামারু চাচা এল। বেড়ালগুলো *রেখে গেল।*

—তোমরা রাখলে! লোকটা খুব ধুরন্ধর দেখছি।

—বাবা তো জোরজার করে রেখে দিল।

—সে আবার কেমন কথা !

—কি জানি। গেল সময় চাইতে, ফিরে এল আটগণ্ডা বেড়াল নিয়ে। বাবা সতেরোটা শিলিং পেত কামারু চাচার কাছে। বোধহয় দিতে পারছিল না বলে বেড়ালগুলো রেখে দিয়েছে।

সত্যি দ্বীপটা বড় আজব, আর আরও আজব এই সব মানুষগুলো। মানুষ টাকা-পয়সা না পেলে, গরু-ছাগল, তামা-কাঁসা নিয়ে আসে। সামসের কেন যে এগুলো নিয়ে এল ! মাথা খারাপ !

সাবিনা বলল, সময় পাওয়া গেছে।

সময়, কিসের সময়, সে কিছুই বুঝল না। সে বলল, করমর্াত পাখিটা দেখছি না।

—বাবার সঙ্গে গেছে।

—সাবধানে রেখ। কখন লোভে পড়ে বেড়ালগুলো খেয়ে ফেলবে !

ওর হাতে রূপোর রুলি জোড়া খুব মানিয়েছে। সরিত বলল, তোমার বাবা কিছু বলে নি !

সাবিনা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল।

—এমন এক জোড়া রূপোর চুড়ি দিলাম।

—বাবা কেমন হয়ে গেছে। কিছুই বলে নি।

—তোমাদের কিছু একটা হয়েছে তবে।

সাবিনা ভাবল বলবে কি বলবে না। দ্বীপের মানইজ্জত সে কিছুতেই নষ্ট করতে রাজী না ভিনদেশীর কাছে। সে বলল, না, তেমন তো কিছু হয় নি।

বেড়ালগুলো গুটি গুটি উঠোনে নেমে এসেছে। বেড়াল দেখলে এমনিতেই তার গা শির শির করে। তারপর এতগুলো বেড়াল। বেড়ালগুলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এমন ধুমসো বেড়াল সে জীবনে দেখে নি। এক একটা বেড়াল কিলোখানেক মাংস খেয়ে ফেলবে সহজেই। সে বলল, কাল দেখলাম একটা কচ্ছপ, আজকে

বেড়াল। সামসের কালও ছিল না, আজও নেই। কিসের সময় চাইতে গিয়েছিল ?

সাবিনা নিজের ফাঁদে আটকে গিয়ে বলল, ভিনদেশী, তোমাকে মিথ্যে বলব না। দ্বীপের রাজা আমাকে তার কুড়ি নম্বর বউ করবে বলে ঠিক করেছে। আমার তো ঠিক বয়স হয় নি। বাবা কাছে রেখে আর একটু বড় করে দিতে চায়। বড় হলেই চলে যাব।

—রাজা কোথায় আবার!

—কেন, স্যামসন সাহেব।

—সেই বুড়ো লোকটার এত সখ।

সাবিনা মাথা নিচু করে রেখেছে। কিছু আর বলছে না। সরিত বাধ্য হয়ে বলল, রাণী হবার খুব সখ বুঝি তোমার ?

চোখগুলো ভারি উদাস দেখায় সাবিনার। কেমন কারাগারে বন্দিনী মনে হয় সাবিনাকে। গতকালও এমন সব কি বলেছিল, সে তত গুরুত্ব দেয় নি। বুড়ো রাজা, ডাবের জল, পাতার মুকুট, এমনই সব যেন বলেছিল। সে তখন বলেছিল, মরে যাবার সময় আমার কথা মনে রেখ সাবিনা, আমি আর কিছু চাই না। এখন বুঝতে পারছে, স্যামসন খুবই স্বেচ্ছাচারী মানুষ। জাহাজে সে পরশুদিন স্যামসনকে দেখেছে। খুব বিনয়ী ভদ্র মনে হয়েছে তাকে। আর এখন মনে হচ্ছে লোকটার ভেতর একটা শয়তান আছে। শয়তানের হাতে পড়ে যাবে সাবিনা।

সরিত বলল, তোমরা অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পার না ?

—কোথায় যাব! আমাদের দাসখত লেখা আছে। দাদু এখানে স্যামসনের বাবার কাছে দাসখতে সই করে তবে এসেছে। আর কোথাও যেতে পারব না।

—লোকটা একা, আর তোমরা এতগুলো লোক!

সাবিনা হাসল। চোখে মুখে কাতর যন্ত্রণা। চুপচাপ উঠে গিয়ে রোদে শুকনো জামা-কাপড় তুলে ফেলল।

সরিতের কেন জানি ইচ্ছে হল, এ-দ্বীপটায় থেকে গেলে কেমন হয়! দ্বীপটার বন-জঙ্গল এত গভীর যে সে অনায়াসে পালিয়ে থেকে যেতে পারে। কেউ টেরই পাবে না।

দূরে তখন দেখল, কেউ একটা কাঠের গুঁড়ি ঠেলে ওপরে তুলে আনার চেষ্টা করছে। পারছে না। বার বার গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। সে ডাকল, সাবিনা, কে লোকটা?

—বাবা।

—কি করছে?

—বাবা বোধহয় আবার সমুদ্রে যাবে। যাবার আগে কাট-কুটো যা লাগবে, চাল-ডাল, মসলাপাতি, মাছের চর্বি—সব পাঁচ-সাত দিনের মতো রেখে যাবে। মা কুটুমবাড়ি যাবার পর বাবা কোথাও বেশি দিন গিয়ে থাকত না। মাছ ধরার জন্য আগে বাবা কখনও কখনও পাঁচ-সাত দিন কাটিয়ে আসত। আমি বড় হয়ে যাচ্ছি, আর আমিও তো বেশি দিন নেই, এখন তো এ-দ্বীপে আমার ওপর সবার নজর, কোথাও পালাতে পারব না, কিছু আবার অঘটন হলে রংকি থেকে গাধার পিঠে সব দামী দামী জিনিস চলে আসবে—আমার কত সুখ এখন!

॥ দশ ॥

পরদিন দেখা গেল আটগণ্ডা বেড়াল নিয়ে সামসের সত্যি সমুদ্রে ভেসে গেল। সকালে দৃশ্যটা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সবাই দেখেছে। আর সবাই ভেবেছিল, মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে সামসেরের। এমনিতে ভারি গোঁয়ার মানুষ। তার ওপর জেদী স্বভাবের। আর কত দূরেই বা যাবে। মিষ্টি আলু সেদ্ধ, মাছ পুড়িয়ে খুব বেশিদিন সমুদ্রে থাকা যায় না। ফিরে আসতে হয় দ্বীপে। মিষ্টি জলের জন্য অন্তত ফিরে আসবেই সে। সমুদ্রে শুকিয়ে মরে যেতে কার ভালো লাগে!

সরিত ডেকে দাঁড়িয়েছিল। সে দূরে দেখতে পাচ্ছে, পাহাড়ের

মাথায় সাবিনা। বাপের নৌকা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসতেই নেমে গেল। সরিত ডেকের কাজকর্মে আর মনোযোগ দিতে পারছে না। কেমন ভেতরে রক্তপাত আরম্ভ হয়েছে মনে হচ্ছিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বাপটাও অমানুষ। সাবিনা একা থাকবে। আজই রাতে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। গতকাল সাবিনার পাশে বসে যা ভেবেছিল, সকালে মনে হয়েছে ছেলেমানুষী। সে ইচ্ছে করেই আর বিকেলে যায় নি। এ-বয়েসটার অনেক দোষ। মাথা ঠিক রাখা যায় না। কিন্তু আবার কেন ভেতরটা আঁকুপাকু করছে সাবিনার কথা ভেবে। সবাই একটা মানুষের খেয়াল-খুশিকে কত সহজে বরদাস্ত করে যাচ্ছে। আসলে এরা সবাই খুব অসহায়। স্যামসনের বন্দুকটা ভয় পাইয়ে রাখে। নলের মুখে ধোঁয়া উঠলে, ওদের বুক কাঁপে।

এবং রাতে যখন জাহাজ ছাড়ছে, বেশ রাতই হবে, মধ্য রাতটাত মনে হল, ওর ফোকসালের দরজায় দাঁড়িয়ে, আশ্চর্য, সাবিনা। একটা পুঁটুলিতে ওর যা কিছু প্রিয়, এই যেমন লম্বা গাউন আর করমর‍াঁত পাখিটা, নিয়ে সে চলে এসেছে।

সরিত বলল, তুমি!

—তোমার সঙ্গে যাব ভিনদেশী। আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যাও। ওরা সবাই মিলে আমাকে তা না হলে কুটুমবাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

জাহাজে মেয়েমানুষের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে এতটুকু সময় লাগে না। এক্ষুণি সব জাহাজীরা নেমে আসবে, পাশাপাশি ফোকসাল থেকে ছুটে আসবে সবাই। সরিতের ফোকসালে মেয়েমানুষ! সরিত ভারি বিব্রত বোধ করছে।

সে বলল, এটা তুমি কি করলে!

পায়ে পায়ে সাবিনা ভেতরে ঢুকে গেল। সোজা বাংকে বসে পড়ে বলল, আমাকে নিয়ে যাও ভিনদেশী। তুমি যা বলবে তাই করব। তোমার সব কথা শুনব।

অবোধ বালিকা! সরিতের কাতর চোখ-মুখ অসহায় দেখাচ্ছে খুব। পৃথিবীটা তো মেয়ে তোমার মতো সরল নয়। আমি নিয়ে যাবটা কোথায়! স্বপ্নে এমন সব ঘটনা আকছার দেখা যায়। কাজকর্ম না থাকলে এমন সব অলস কল্পনা মাথায়ও গিজ গিজ করতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি ঘটনাটা ঘটেই যায় তবে মানুষ যে কি বিপদে পড়ে যায় তুমি বুঝতে পারবে না মেয়ে।

সাবিনা যেন নিশ্চিন্ত, সে বাংকের নিচে বেশ ঠেলেঠুলে দিচ্ছে তার পুঁটুলি। করমরাঁত পাখিটাকে ধমকাচ্ছে, চেঁচাবি না, বাবুদের ঘুম ভাঙ্গলে রাগ করবে। কি শয়তান দ্যাখো, তোমার সঙ্গে কিছুতেই যাবে না বলছে।

—সাবিনা।

সাবিনা তাকাল।

—তুমি নেমে যাও। এক্ষুণি কাপ্তানের তলব আসবে। জাহাজে এটা চলে না। তুমি কিছু নিয়মকানুন জান না। মানুষের জন্য কত নিয়মকানুন তৈরি হয়েছে যদি জানতে, জানলে, এখানে আসতে সাহসই পেতে না।

—আমি তো কিছু করছি না ভিনদেশী। তোমার সঙ্গে শুধু চলে যাব। তুমি যা বলবে, যদি দাঁড়িয়ে থাকতে বল, দাঁড়িয়ে থাকব। বসতে বললে বসব। রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে বললে তাই খাওয়াব। আমি তো আর কিছু চাই না ভিনদেশী। মানুষ বড় হলে তো একজন মেয়ের দরকারই পড়ে, পড়ে না! কি, কথা বলছ না কেন ভিনদেশী!

বালিকার ভারি সরল অকপট কথাবার্তা! সত্যি তো সে শুধু সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু এতসব ভাবনার সময় কোথায়! সারেঙ, টিণ্ডাল, চিফমেট দৌড়ে এসেছে। সিঁড়ি বেয়ে একজন মেয়ে উঠে এসেছে জাহাজে। স্যামসন খবর পাঠিয়েছে, পালিয়ে যাচ্ছে কেউ। তাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে তার লোকজন। শয়তানের চর ঠিক খবর পৌঁছে দিয়েছে।

॥ এগারো ॥

কাপ্তান হাভার্ড এমনিতে বেশ হাসিখুশি ধর্মভীরু মানুষ। অবসর সময়ে বাইবেল পড়তে ভালোবাসেন। তিনি নিচে ডেক-চেয়ারে বসেছিলেন। তখন প্যাংকো সাব নিচ থেকে বলল, মিঃ হাভার্ড, একটু কথা বলতে চাই।

জাহাজের হাসিল খোলার জন্য বয়ার কাছে চলে গেছে সেকেণ্ড-মেট। সঙ্গে থার্ড-মেট এবং জাহাজের লোকজন। জাহাজ ছাড়ার আগে বাইবেলে সামান্য সময় ঈশ্বর মাহাত্ম্য অনুভব করা স্বভাব তাঁর। রাত এগারোটা বেজে গেছে। ঠিক বারোটায় জাহাজ সেল করার কথা। হাসিল খুলে ফেললেই দড়িদড়া তুলে ফেলা, নোঙর তুলে ফেলা। বয়াতে জাহাজ বাঁধা। সব খুলে ফেললেই গ্যাংওয়ে থেকে সিঁড়ি তুলে নেওয়া হবে। আর তখনই কিনারায় কেউ দাঁড়িয়ে একটু কথা বলতে চাইছে। সে ঝুঁকে দেখল, প্যাংকো সাহেব। স্যামসনের ম্যানেজার। সঙ্গে তিন-চার জন কিম্ভূতকিমাকার উল্কি পরা লোক।

প্যাংকো সাব ওপরে উঠে বলল, জাহাজে সামসেরের মেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাকে নিতেই তার আসা।

তিনি খুব অবাক হলেন। সামসের কে, মেয়েটাই বা কে, আর যাচ্ছেই বা কোথায়! কেউ কি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে? এতটা সাহস কার হবে! জাহাজীদের মেজাজ-মর্জি দীর্ঘ সফরে ঠিক থাকে না। বন্দর পেলে সামান্য এলোমেলো স্বভাবের এমনিতেই হয়ে যায়, কিন্তু মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া! তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। এ হতেই পারে না। আমার জাহাজীরা ভীষণ ভালো লোক। ওরা এমন একটা কাজ করতেই পারে না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। সামসেরের মেয়েটার কাছে

আপনাদের কেউ হয়তো পুরনো জামাকাপড় বিক্রি করতে গেছিল। দু'দিনেই মহব্বত। একটু বিদ্রূপ করতে চাইল প্যাংকো।

—তাই বলে সঙ্গে নিয়ে যাবে! হতেই পারে না। কোয়ার্টার মাস্টার! কাছেই ছিল দু'নম্বর কোয়ার্টার মাস্টার। সে সেলাম ঠুকে বলল, আজ্ঞে যাই।

—দেখ তো কে একটা মেয়ে এনে তুলেছে জাহাজে। চিফ-মেট কোথায়, কি হতভাগা, মাথা-টাথা কি গোলমাল হয়ে গেছে!

চিফ্-মেট এসেই খবর দিয়েছিল, তিন নম্বর গ্রীজারের ঘরে একটা মেয়ে এসে বসে আছে। জাহাজ থেকে কিছুতেই নামবে না বলছে। এঞ্জিন-সারেঙ, ডেক-সারেঙ সবাই জোরজার করেও কিছু করতে পারছে না।

কাপ্তান ভীষণ দমে গেলেন প্রথমে। বললেন, বুঝিয়ে বল। বল, জাহাজ খুব খারাপ জায়গা। বল, জাহাজ যখন ফের ঘুরে আসবে তখন আবার দেখা হবে। গোলমাল করলে পুলিশে দিতে হবে বল। পুলিশ কথাটা বলেই হাভার্ড বুঝতে পারলেন দ্বীপে পুলিশ আসবে কোত্থেকে। শুনেছেন, স্যামসনই সব। এমন একটা বন-জঙ্গলে আর একটা ছোট্ট দ্বীপে এসে কার কি-ই বা লাভ। স্যামসন এতদিন, দেশে না গিয়ে আছে কি করে! ওরা স্যামসনেরই লোক। পুলিশ বলতে, আদালত বলতে এরাই। তিনি বললেন, বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যান।

আর তখনই হোঁৎকা মতো একটা লোক চিৎকার করতে করতে আসছে। জ্বলে গেল। মরে গেলাম। প্যাংকো দেখল, ছকুন নিজের হাত চেপে ধরে ব্রীজের দিকে ছুটে আসছে। ছকুনের হাত কামড়ে দিয়েছে। কাপ্তান বললেন, ভারি মুশকিল হল তো!

ছকুন বলল, ধরে আনতে গেছিলাম হুজুর। ডাইনি কামড়ে দিয়েছে। পুড়িয়ে মারব। বাপ-মেয়েকে পুড়িয়ে মারব।

হাভার্ড যতটা সহজ ভেবেছিলেন, ঠিক ততটা সহজ আর মনে হচ্ছে

না। তিন নম্বর গ্রীজার কোন্ লোকটা—ঠিক হুবহু মনে করতে পারছেন না। কলকাতা বন্দর থেকে তুলে নিয়েছেন এই সব জাহাজীদের পাঁচ মাসও হয় নি। তারপর মনে হল, বুঝতে পারছেন, সেই ছেলেটা যার কথাবার্তা খুব ধীর এবং যে সহজে কাজ-টাজ বুঝে নিতে পারে। সারেঙের পক্ষে কথা বলার জন্য দু'বার ডাইনিং হলেও এসেছিল, লম্বা সুশ্রী মতো ভারতীয় ছেলেটির স্বভাব তো কখনও খারাপ মনে হয় নি। তিনি মার্কনি-সাবকে ডেকে ছকুনের হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিতে বললেন। নিজে না গেলে সামলাতে পারবেন না। তাই ডেক ধরে কিছুটা হেঁটে গেলেন। জাহাজের শেষ প্রান্তে খোলের ভেতর ওদের ফোকসালগুলো। গ্যালি পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে কিছুটা নেমে যেতে হবে।

তিনি পিছনে আসছেন শুনেই সব জাহাজীরা তটস্থ হয়ে গেল। সরিতের ফোকসালে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। কাপ্তানের নাম শুনেই সবাই ভালো মানুষের মতো সিঁড়ির দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি নিচে না নেমে সরিতকে ডেকে পাঠালেন, কি হচ্ছে এ সব, ধমক লাগালেন।

সরিত বলল, কি করে চলে এসেছে, আমি কিছু জানি না।

—স্টুপিড, তুমি কেন মরতে গেছিলে ওখানে। জাহাজ ছাড়তে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কোম্পানীর লোকসান তুমি দেবে! এবং নিচে নেমে তিনি খুবই বিচলিত বোধ করলেন। কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যাবে ভয়ে বাংকের রেলিং শক্ত করে ধরে আছে মেয়েটা। তিনি বুঝতে পারলেন, জোরজার করে কিছু হবে না। আর এমন করুণ দৃশ্যের মুখোমুখী জীবনেও তিনি হন নি। ওপরে উঠে সরিতকে বললেন, ওকে বুঝিয়ে রেখে এস। তিনি তারপর চলে যাচ্ছিলেন—খুবই অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল—এমন পবিত্র মুখ জীবনেও দেখেন নি। ওপরে উঠে বললেন, কাল বুঝিয়ে রেখে আসবে। প্যাংকো এবং তার অনুচরদের ডেকে বললেন, আপনারা যান, দেখি কি করা যায়!

প্যাংকো বলল, সে তো হয় না। দ্বীপের সুনাম নষ্ট হোক আমরা কখনও চাই না।

তিনি বুঝতে পারছেন, এরা ওকে নিয়ে যাবেই। বললেন, মেয়েটার বাপ কোথায় ?

—সমুদ্রে গেছে।

—ওর বাড়ির কাউকে নিয়ে আসুন। যা দেখলাম, জোর করে কিছু হবে না। খুবই ছেলেমানুষ।

কামারু বলল, ওর চাচা হই আমি। যাব স্যার ?

—যাও, গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাও। ভারি ভীতু স্বভাবের মেয়ে।

কামারু নিচে নামছে দেখে সরিত বলল, ও যাবে না।

—তার মানে !

—মানে যাবে না।

কামারু সরিতের শক্ত সমর্থ চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল। বলল, এটা কি ভালো হচ্ছে। দ্বীপের মেয়ে নিয়ে তোমরা ভেগে যাবে।

সরিত লোকটার সঙ্গে অনেক তর্ক করতে পারত। কিন্তু সে জানে এ-জন্য সেই দায়ী। কাপ্তান খুবই ভালো মানুষ বলে তার ওপর তেমন একটা ক্ষেপে যান নি। বরং আলাদা ডেকে বলে গেছেন, যদি যেতে না চায় থাক। রাতে আর ঝামেলা করে লাভ নেই। সকালে বরং বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে এস। আবার তো আসছ, এমনও বলতে পার। জাহাজ রাতে সেল করছে না।

কামারু ওপরে উঠে গিয়ে বলল, না স্যার, ঢ্যাঙা লোকটা নিচে নামতেই দিল না।

কাপ্তান ডেকে পাঠালে সরিত সব বলে দিল। বুড়ো স্যামসন একটা আস্ত শয়তান। স্বজাতির এমন একটা শয়তান চেহারা ফুটে উঠতেই কাপ্তান বুঝতে পারলেন—এ জন্যই আর দেশে ফিরে যাবার নাম করে নি লোকটা। খুবই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের

মাথায় একটা গীর্জা দেখেছেন। রাতে সেই গীর্জা কোন্ টিলার মাথায় বুঝতে পারছেন না। পেলে যেন হাঁটু মুড়ে অশুভ সেই আত্মার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতেন। এবং প্যাংকো যখন ফের বলল, স্যার, দ্বীপের সুনাম নষ্ট হোক আপনারা কি তাই চান!

কাপ্তান পায়চারি করছিলেন ব্রীজে। প্যাংকোর কথায় স্থির অবিচল এবং অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এখনও ভেসে আছে। তলিয়ে যায় নি। স্বেচ্ছাচারিতার শেষ থাকা দরকার।

প্যাংকো সাহেব ভীত হয়ে পড়ল। শেষে বলল, যা ভালো বুঝুন—করুন। আমাদের এর ভেতর জড়াবেন না স্যার।

দ্বীপে খবরটা রাতেই রটে গেল। কি দজ্জাল মেয়ে রে বাপ! দ্বীপটার নাম ডোবাল। স্যামসন হাই তুলতে তুলতে সব শুনছিল। প্যাংকোর হাত-পা থর থর করে কাঁপছে। স্যামসনের নির্বিকার চোখ-মুখ দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। তবু সে জানে, কার কপালে শেষ পর্যন্ত কি লেখা আছে স্যামসন সবই হাই তুলতে তুলতে ঠিক করে ফেলেছে।

স্যামসন অতি সহজেই বলল, থাকুক না। সকাল হলে যখন রেখে যাবে বলেছে, তখন তোমাদেরই বা এত মাথা ব্যথা কেন বুঝি না। হাভার্ড তো ঠিকই বলেছে। জোরজার করে কিছু হয় না। যেন ধন্যবাদ দেবে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল স্যামসন। তারপর অদ্ভুত কর্কশ গলায় ডাকল, প্যাংকো।

প্যাংকো চলে যাচ্ছিল। ডাক শুনে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ফিরে দেখল, স্যামসস পাইপে আগুন দিচ্ছে।

প্যাংকোর মাথায় শোলার হ্যাট। পরনে খাকি প্যাণ্ট-সার্ট। মোজা খাকি রঙের। প্রায় একজন পুলিশ অফিসারের মতো পোশাক। প্যাংকো শুধু এই ধরনের খাকি প্যাণ্ট-সার্ট পরার অনুমতি পেয়েছে স্যামসনের কাছ থেকে। দ্বীপের লোকগুলিকে সে বিশ্বাস করে না।

প্যাংকোকেও সে বিশ্বাস করে না। জাহাজ থেকে যা কিছু আসবে —সবই ওর লিস্টিমতো। জাহাজে কখনও প্যাংকোকে একা পাঠায় না। কি জানি কখন লোভ জন্মে যাবে, দ্বীপে আর একটা আগ্নেয়াস্ত্র আমদানী করতে পারলেই ডুয়েল হয়ে যাবে দ্বীপে। কামারু, ছকুন, অথবা ইলাদ কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে। ওরা তিনজনেই একমাত্র তার বিশ্বস্ত অনুচর। পাইপ দু'বার টেনে প্যাংকো সাহেবের মুখ দেখল স্যামসন। তারপর বলল, নেটিভ বাগারটা সব বলে দিয়েছে তা হলে ?

—সব।

—হাভার্ড বলল, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ জলের তলায় তলিয়ে যায় নি ?

—তাই বলল, স্যার।

—হাভার্ড জানে, ইচ্ছে করলেই আমি এদের কণ্ট্রাক্ট বাতিল করে দিতে পারি ?

—জানে স্যার।

—কিন্তু কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে মধ্যযুগীয় নাইট।

—নাইট যদি হয় স্যার, তবে নেটিভটা !

—হেল্ ! তারপর স্যামসন ফিরে যাবার সময় রেলিঙে ঝুঁকে কি দেখল। সমুদ্রের তেমনি গর্জন শোনা যাচ্ছে। রাত পোহাতে দেরি নেই। শেষ রাতের চাঁদ দ্বীপটাকে ভারি মায়াবী করে রেখেছে। কি ভেবে পুলকে সে গান গাইতে থাকল। প্যাংকো কিছুতেই লোকটার মেজাজ-মর্জির রহস্য ছুঁতে পারে না। সে চলে যাবে, না খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে, বুঝতে পারছে না।

॥ বারো ॥

সাবিনা চুপচাপ বসে থাকল। কত লোক এল, কাপ্তান থেকে মেজ-মেট, সারেঙ, টিণ্ডাল, কারো প্রতি তার এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। কেবল ভয়ে আছে ভিনদেশী মানুষটার জন্য। কেমন মুখ শুকিয়ে গেছে মানুষটার। তবে কাপ্তান, মেজ-মেট খুব ভালো। সাবিনা মেজ-মেটের

সঙ্গে দুটো একটা ইংরেজীতে কথাও বলেছে। যেমন মেজ-মেট বলেছিল তোমার নাম ?—সে বলেছিল, সাবিনা।

—বাপের নাম।

—জন সামসের।

—বাপ বকবে না ?

—বাপ মাছ ধরতে গেছে।

—কি মাছ ধরে ?

—বড় বড় সুরমাই মাছ।

—স্যামসনের খাদে কাজ করে না ?

—করে।

—কোথায় যেতে চাও ?

সাবিনা ভিনদেশীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছে, ওর সঙ্গে যেতে চাই।

—ও তো জাহাজে থাকে। মেজ-মেট হাসতে হাসতে বলেছিল।

—আমিও জাহাজে থাকব।

এরপর সবাই বুঝেছিল এই সরল বালিকার সঙ্গে আর কোনো কথা চলে না। কাপ্তান উঠে গেলে, মেজ-মেট সরিতকে ওপরে ডেকে নিয়ে যাবে ভাবল। এবং সরিত ওপরে উঠতে যাবে, আশ্চর্য সাবিনাও পেছন ধরেছে তার। যদি ফেলে ভিনদেশী পালিয়ে যায়। সরিত ওকে বুঝিয়ে বলল, সে এক্ষুণি আসছে। সে যখন সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছিল মেজ-মেটের সঙ্গে পিছনে একবার কি ভেবে যে তাকিয়েছিল! এমন কাতর চোখ সে জীবনেও দেখে নি। সাবিনা ওর দিকে বড় অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে।

মেজ-মেট গ্যালিতে ঢুকে বলল, কাল সকালে বুঝিয়ে রেখে আসলেই চলবে না। ওর আর কেউ আছে কিনা দেখবে।

সরিত বলল সে তো আছে স্যার। বড়ই বুড়ো মানুষ। আবিন চাচা বলে সবাই তাকে ডাকে। তাকেই ধরতে হবে।

মেজ-মেট যাবার সময় বল্ল, কাউকে ভিড় করতে দেবে না। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। পাশের বাংকে ওকে থাকতে দাও। কাল তুমি নৌকায় দ্বীপেই থেকে যাবে বলে ওর সঙ্গে যাবে। এবং আবিন চাচাকে সব বুঝিয়ে বলবে। আর বাপটাই বা কেমন। শুনলাম আটগণ্ডা বেড়াল নিয়ে সে কোথায় সমুদ্রে উধাও হয়েছে। মেয়েটার কথা একবার ভাবল না।

সরিত কাপ্তানকে সব বলেছে। কেন মেয়েটা এভাবে ভীষণ এক-রোখা হয়ে গেছে। সেই কচ্ছপের কথা বলতে পারত মেজ-মেটকে। যেমন সে কাপ্তানকে সব বলেছিল, না বললে তাকে ভুল বুঝতে পারত, এবং এই জন্যেই বলা, মেজ-মেটকে এ সব না বললেও কিছু আসে যায় না। তবু একটা ব্যাপারে মেজ-মেটকে তার খুব দরকার এখন। কারণ, কোন বোটটা সে নেবে। সব চেয়ে ছোট বোটটা নিলেই ভালো হয়। বোট-ডেক থেকে হারিয়া করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সহজেই নামানো যায়। সহজেই ওঠানো যায়। এবং দু'জন লোক হলেই কাজটা করা যায়।

সে মেজ-মেটের সঙ্গে বোট-ডেক পর্যন্ত কথা বলতে বলতে উঠে গেল। বলল, স্যার তবে তিন নম্বর বোটটা নামিয়ে নেব। ছোট আছে। কাউকে ডাকাডাকি করতে হবে না বিশেষ। আরসাদ আর আমি নামিয়ে নেব। তখনই কেমন একটা সংশয় মেজ-মেটের মাথায় খেলে গেল। বলল, আচ্ছা মেয়েটা এই রাতে সহজে এল কি করে। জাহাজ বয়াতে বাঁধা। কোনো নৌকায় আসার কথা। সেটা কোথায়। সেটাতো দেখছি না।

সরিত ঝুঁকে দেখল সত্যি কোথাও কিছু নেই। অবাক। সাবিনা এতটা কি তবে সাঁতরে এসেছে। সাঁতার কেটে এলে ওর পোশাক ভেজা থাকত। সে কেমন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

নিচে নেমে দেখল, একদল জাহাজী ওকে নিয়ে নানারকম মসকরা করছে। সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে সেই স্যামসন,

মনে হচ্ছিল কাছে পেলে সে তাকে এক্ষুণি গলা টিপে ধরত। ঐ লোকটার ভয়েই মেয়েটা জাহাজে উঠে এসেছে। আর এখন ইচ্ছে হচ্ছে এই সব সাঙ্গপাঙ্গদের লাথি মেরে দরজা থেকে তাড়িয়ে দিতে। অবশ্য সে জানে ওতে বিড়ম্বনা বাড়তে পারে। কাপ্তানের দোহাই ছাড়া এখন কিছু হবার জো নেই। সে যদি বলে, তোমরা চলে যাও মেয়েটা ঘুমোবে, তবে বলবে, একা ঘুমোবে কেন, আমরা নেই বুঝি। আমরা সঙ্গে ঘুমোলে কি হবে সরিত! এবং সে জানে জাহাজী মানুষদের এ-সব কথায় কোনো দোষ নেই। তারা আরও কত খারাপ কাজ সহজেই এই জাহাজে করে ফেলতে পারে, এবং এমন একজন সরল বালিকা রাতে জাহাজে রয়ে গেছে, কটা লোকের সঠিক ঘুম হবে তাও হাতে গুণে বলা যায়। অগত্যা তাকে যা করা দরকার এখন, খুব রাশভারি গলায় বলল, এই যে মিঞারা কাপ্তান কি বলে গেছে জান?

—কি বলবে আবার!

এঞ্জিন-সারেঙ তখন নিচে নেমে আসছিল। এঞ্জিনে যারা কাজ করে, তারা কাপ্তানের চেয়েও এই মানুষটিকে বেশি ভয় করে। সরিত বলল, চাচা সাবিনা এ-ঘরেই থাকছে। আমি বাইরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকছি।

সারেঙ বললেন, এ-ছাড়া আর কি করবি। তিনি এবার অন্যান্য জাহাজীদের বললেন, রাত হয়েছে মিঞারা ফোকসালে যাও। দেশে তোমাদেরও মাগ-ছেলে আছে। জাহাজী হয়েছ বলে একেবারে ইজ্জত দিয়ে দাও নি।

সরিত দেখল আশ্চর্য কাজ হয়েজে সারেঙের কথায়। সবাই দরজা থেকে চলে গেল যে যার ফোকসালে। সে এবার কি করে মেয়েটার ওপর ঝাল ঝাড়বে বুঝতে পারছে না। তার কারণ জাহাজীদের কিছু ইতর কথাবার্তার জন্য এই সাবিনাই দায়ী। কিন্তু যখন সে সাবিনা বলে ডাকল, এবং সাবিনা চোখ তুলে তাকাল, সরিত তখন এতটুকু কঠিন

গলায় কথা বলতে পারল না। কেবল বলল, এই যে বিছানা আছে শোও। তারপর মনে হল কিছু খেয়েছে কিনা মেয়েটা—সে বলল, কিছু খাবে! এই রুটি-মাংস। দেখি, ওপর থেকে কিছু যদি যোগাড় করতে পারি।

সাবিনা বলল, না। ভিনদেশী আমি খাব না। তোমার জন্য আমি শংখিফুলের পায়েস নিয়ে এসেছি। তুমি খাও।

রাত বেশ গভীর। সরিত কিছুতেই আর মেয়েটার অবুঝ ব্যবহারের জন্য রাগ করতে পারছে না। তার ফোকসালটা এমনিতেই ছোট। মাত্র দুটো বাংক। নিচের বাংকে থাকত জিয়াউর। সেও তার মতো গ্রীজারের কাজ করত জাহাজে। কিন্তু কি যে মর্জি হল জিয়াউরের, কার্ডিফে জাহাজ থেকে পালিয়ে গেল। দেশে ওর বিবি, ছেলে-মেয়ে সব আছে, তাদের জন্য ওর প্রাণও কাঁদত অথচ কি যে হয় মানুষের, একদিন সে রাতে জাহাজে ফিরে এল না। এল না তো আর এলই না। এ-সব ক্ষেত্রে জাহাজী কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা যা করে থাকে তাই করে ফেলল। ওকে ডেজার্টারের লিস্টে নাম লিখিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। সেই থেকে এই ফোকসালটাতে সরিত একাই আছে। এবং একেবারে নিচে শেষের দিকে বলে, জাহাজীদের যাওয়া-আসার শব্দও কানে কম আসে। বিশেষ করে সারেঙের শাসানির পর আর কারো সাহসই হয় নি এদিকটাতে আসার।

এখন সে সাবিনাকে যা খুশি গালমন্দ করতে পারে। এবং তাই ইচ্ছে হয়েছিল। কারণ সকাল বেলায় মেয়েটা জাহাজে ঠিক আর একটা সিন করবে। সে এ-ভাবে নিজের সঙ্গে আসলে লড়ছিল। সে বুঝতে পারছিল যত বেশি রেগে যাচ্ছে, তত সে মনে মনে অসহায় বোধ করছে। এবং রাগে ভালো করে কথাও বলতে পারছে না।

তারপর ভাবল এখন এত বেশি ভেবে লাভ নেই। যা হবার সকালে হবে। সে বলল, সাবিনা তুমি নিচের বাংকে শুয়ে থাক। আমি বাইরে যাচ্ছি।

সাবিনা বলল, বাইরে কোথায় !

এই দরজার কাছেই থাকব। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়।

সাবিনা বলল, শংখি ফুলের পায়েস খাবে না ?

—না।

—খিদে নেই বুঝি। তবে রেখে দিচ্ছি। তোমার খাবার কোথায় থাকে ?

ভিতরে ভিতরে সরিত মরে যাচ্ছিল। পৃথিবীটা যেন মনে হচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে সাবিনাকে। সবুজ রঙের গাউন, হাতে সেই রূপোর বালা, এবং মুখে শংখি ফুলের গুঁড়ো চিক চিক করছে। যেন সত্যি সে সরিতের সঙ্গেই চিরদিন থাকবে। সে একবার সরিতকে বলেও ফেলল, তোমার জামাকাপড় কোথায় রাখ ভিনদেশী ?

সরিত বলল, কেন কি হবে ?

—আমার গাউন, আমার চাদর, আমার প্যান্ট রাখব।

এবার সরিত বাংকে বসে পড়ল। বলল, আচ্ছা সাবিনা তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যেতে চাইছ।

—বারে তোমার দেশে। তুমি যেখানে থাক।

—সেখানে তো তোমার থাকা হবে না।

—কেন হবে না। তুমিই তা বলেছ, তোমার দেশটা আমাদের দ্বীপটার চেয়েও বড়। এতটুকু ছোট দ্বীপে আমার জায়গা হয়, আর অত বড় একটা দেশে আমার জায়গা হবে না !

সরিতের ইচ্ছে হচ্ছিল সবই বলে দেয়। কাপ্তান যে তাকে সকালে দ্বীপে রেখে আসতে বলেছে তাও। এবং সে আবার যখন জাহাজ নিয়ে ফিরে আসবে তখন না হয় তুলে নেবে, এমন মিথ্যে কথাও বলতে পারে। কিন্তু যখন কেউ কোনো পবিত্র ঘটনার মুখোমুখী হয়ে যায়, তখন যত বড় নিষ্ঠুরতাই থাকুক, শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়ে ওঠে না। সে বলতে পারল না, সকালে তোমাকে দ্বীপে রেখে আসার জন্য

আমার ওপর হুকুম হয়েছে সাবিনা। আমি কিছু করতে পারিনা আর।

এবং এ-সব কারণেই কেমন দুঃখী দেখাচ্ছিল সরিতকে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটার মতো। মুখ থম থম করছে। বোধহয় কান্না পাচ্ছিল। সে কেন যে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারছে না!

সাবিনাই বলল, ভিনদেশী তুমি খুব স্বার্থপর। তোমার কাছে এসেছি তুমি কত খুশি হবে, তা না, মুখ গোমড়া করে রেখেছ।

সরিত চোখ তুলে দেখল। সে পুরুষ মানুষ বলেই হয়তো চোখ ফেটে জল বের হচ্ছে না, অথবা প্রাণপণে সব চাপবার চেষ্টা করছে।

সাবিনা খুব কাছে এসে দাঁড়াল।—আমাদের বাড়ি যখন তুমি আসতে আমার কি আনন্দ হত। তোমার কাছে আমি এসেছি, তোমার আনন্দ হয় না ভিনদেশী?

সরিত বলল, হয়।

—তবে তুমি আমার সঙ্গে আগের মতো কথা বলছ না কেন?

সরিত এবার কোনো রকমে যেন বলল, তুমি যে চলে যাচ্ছ, তোমার বাবা জানে?

—না।

—আবিন চাচা?

—না।

—তুমি একজন ভিনদেশীর সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছ, লজ্জা করে না!

—বা রে লজ্জা কোথায়। আমি কত ছোট বয়স থেকে তোমার মতো একজন মানুষের কথা ভেবেছি। তুমি তো আমার নিজের মানুষ। নিজের মানুষের সঙ্গেই তো সবাই যায়।

সরিত বলল, সাবিনা প্লিজ বুঝতে চেষ্টা কর—এ হয় না। আমি সামান্য কাজ করি জাহাজে।

—তা আমি বুঝি জানি না। আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করলে তোমার কষ্ট কত কমে যাবে।

সরিতের ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলতে, হ্যাঁ ঈশ্বর, এ আমাকে কি ফ্যাসাদে ফেললে। আমি কি করি।

সাবিনার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলল, তুমি কথা বল আমার সঙ্গে ভিনদেশী। তুমি কথা না বললে আমার কেমন ভয় করে।

সরিত নিজেকে শেষবারের মতো শক্ত করতে চাইল। বলল, সাবিনা, এই বাংক, এই বিছানা, এখন ঘুমোতে যাও। রাত অনেক হয়েছে। আমার ঘুম পাচ্ছে। কথাটা বলে ওপরের বাংক থেকে তার নিজের বিছানা নামিয়ে বাইরে ঠিক করিডোরে পেতে নিল। তারপর শুয়ে পড়ল।

আর তখনই মনে হল সাবিনা দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সরিত বুঝতে না পেরে উঠে বসল। কাছে গেল। বলল, কি হয়েছে।

সাবিনা মুখ গুঁজে দিয়েছে দু-হাঁটুর ফাঁকে। নরম চুল, শংখি ফুলের সুঘ্রাণ এবং আশ্চর্য লাবণ্য শরীরে মেয়েটার, সব চেয়ে এই ভেঙ্গে পড়া সাবিনা সরিতকে কিছুটা শক্ত করে দিল। সে বলল, তুমি কাঁদছ কেন?

সাবিনা স্পষ্ট জবাব দিল, তুমি আমাকে ভালোবাস না ভিনদেশী।

—ভালো তো ঠিকই বাসি না।

—তুমি ভালো না বাসলে বুড়ো স্যামসন ওর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ভিনদেশী। বুড়োটা আমাকে বড় কষ্ট দেবে। মেরেও ফেলতে পারে ভিনদেশী।

সরিত খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিল। বলল, আমার সঙ্গে এস। তোমার করমর্‌াঁত পাখিটা দ্যাখো যেন আবার ডেকে না ওঠে।

সাবিনা বলল, ও খুব ভালো। আমার খুব কথা শোনে। তারপর সাবিনা দেখল ভিনদেশী ডেকের ওপর দিয়ে যাবার সময় একটা করে

আলো নিভিয়ে দিচ্ছে, আর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আরও দূরে গিয়ে সে দেখল ভিনদেশী একটা ছোট্ট বোট হারিয়া করছে। একমাত্র জাহাজে এখন কোয়ার্টার মাস্টার জাগা। সে আছে স্টারবোর্ড সাইডে। আর সরিত পোর্ট-সাইডের সব চেয়ে ছোট্ট একটা বোটের দড়ি সাবিনাকে জোরে ধরতে বলল। তারপর কিল ঘুরিয়ে দিয়ে কপিকল আলগা করে দিল। এবং একটা দড়িতে ঝুলে সাবিনাকে কাঁধে ঝুলিয়ে প্রায় কোনো অরণ্যদেবের মতো নিচের বোটে নেমে পাল তুলে দিল।

॥ তেরো ॥

তখন জন সামসের মিরাপাসে নৌকা ডাঙ্গায় তুলে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। প্রতিশোধের স্পৃহা মানুষকে এতটা উন্মাদ করে দেয় আগে কখনও সে এটা টের পায় নি। তার মা-মরা বাচ্চা মেয়েটার দিকে বুড়োর এই লোভ তাকে পাগল করে দিয়েছে। সে ক'দিন আগে দ্বীপ থেকে পালিয়েছে। সঙ্গে সামান্য মিষ্টিজল আর অবশিষ্ট আছে। তাকে শেষ পর্যন্ত মানগানুতে ফিরে যেতেই হবে। মানগানুর পূব দিকটায় ইচ্ছা করলে কিছুদিন অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে সহজেই।

বেড়ালগুলো দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলছিল। চার পাঁচদিন সে বেড়ালগুলোকে অভুক্ত রেখেছে। পাগলের মতো এই দ্বীপে এখন এরা নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমে গেছে। এবং এই ছোট্ট দ্বীপটা যা ঘুরে আসতে ত্রিশ চল্লিশ মিনিটও সময় লাগে না, তেমন একটা ছোট্ট দ্বীপে ওরা যে কিছুই খুঁজে পাবে না, কাঁকড়া-শামুক এবং স্টার ফিস, অথবা জেলি জাতীয় আঠালো একরকমের মাছ ঢেউ-এর সঙ্গে উঠে আসতে পারে কিন্তু তা এতই উৎকট আর বিস্বাদ, যতই ক্ষুধার্ত হোক কিছুই তারা স্পর্শ করতে পারবে না। এবং মিরাপাসের চারপাশে জলের গভীরে আছে অজস্র সলমন মাছ, ইচ্ছে করলেই ধরে খাওয়াতে পারে, কিন্তু মনে মনে জন সামসের কি ভেবে

রেখেছে কে জানে। আসলে এই বেড়ালগুলো কামারুর। কামারু সন্তানের মতো ওদের লালন-পালন করেছে। এবং কামারুই সব অনিষ্টের মূলে। সেই হয়তো বুড়ো স্যামসনকে খবর দিয়েছিল, স্যার আরও একজন দ্বীপে বড় হচ্ছে। মাছ ধরা এবং মাছ দেখতে আসা স্যামসন সাহেবের একটা অছিলা মাত্র।

সে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়েছিল। যেমন ভাবে একজন হতাশ যুবক মাঠের ঘাসে শুয়ে থাকে, সে তেমনি শুয়ে আছে। এবং নজর রাখছে বেড়ালগুলোর স্বভাবের দিকে। কি একটা সে আঁচ করার চেষ্টা করল। মুখ দেখলে এমনই মনে হয়। এবং আজই সে একটা বড় রকমের পরীক্ষা করতে চায়। বড় একটা হাঙর সে অনায়াসে বড়শিতে গেঁথে ফেলতে পারে। কিন্তু মাছটা টেনে তোলাই কঠিন। সে খুঁজে দেখেছে এখানে কোনো বড় রকমের গাছের গুঁড়ি নেই। গাছের গুঁড়ি থাকলে, সুতলির প্যাচ খেলে কপিকলটার সাহায্যে সে ধীরে ধীরে তুলে আনতে পারে মাছটাকে। তারপর মাছটা না হয় তোলা গেল। কিন্তু ওর যা ইচ্ছে, যেমন সে চায় মাছটাকে একটা গাছের বড় ডালে ঝুলিয়ে রাখবে। নিচে নৌকাটা থাকবে। নৌকায় থাকবে ঐ আটগণ্ডা বেড়াল। চারপাশে জল। বেড়াল জলে নামতে চায় না। না খেয়ে মরবে তবু না। বড় একটা ডালে অতিকায় মাছটা ঝুলবে। এবং পাঁচ সাত ফুট নিচের থেকে বিড়ালগুলো শুধু দেখবে মাছটা। যতই লাফ দিক অত উপরে উঠতে পারবে না। এবং লাফাতে লাফাতে যখন বেড়ালগুলোর মাথার ঘিলু গলতে আরম্ভ করবে তখন সে মাছটাকে ফেলে দেবে ডাঙ্গায়। এবং বেড়ালগুলোকে ছেড়ে দেবে। তারপর নিশ্চয়ই একটা ভয়ংকর হিংস্র ঘটনা ঘটবে। নিমেষে অতবড় একটা হাঙরের রক্ত-মাংস চেটেপুটে খেয়ে ফেলবে ওরা।

না খেতে পেয়ে বেড়ালগুলোর ক্রমে হিংস্র হয়ে ওঠার স্বভাবটা সে এখন থেকেই টের পাচ্ছে। সে নিজেও এদের আর বিশ্বাস করছে না।

হাতে ওর একটা শংকর মাছের শুকনো লেজ রয়েছে। প্রথম দিন সমুদ্রের গভীরে ঢুকেই পাগলের মতো চাবকে দিল আটগণ্ডা বেড়ালকে। সেই থেকে বেড়ালগুলো যমের মতো ভয় পায় জন সামসেরকে। রাতের নক্ষত্র দেখে সে বুঝতে পারল মিরাপাসে আর থাকা ঠিক হবে না। সকাল হলে রংকি উপত্যকা থেকে দূরবীনে দেখে ফেলতে পারে। পিনচি পাহাড় থেকেও দূরবীনে দেখা যায় দ্বীপটা। সে এখানেই তার স্ত্রীকে কবর দিয়েছিল। কবরের পাশে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। নক্ষত্র দেখল। দূরে রংকিতে গীর্জার চূড়োয় ক্রশে একটা বাতি জ্বলছে। ওটাও নক্ষত্রের মতো। পৃথিবীতে সে একমাত্র ঐ নক্ষত্রটাকে ভয় পায়। সে হাঁটু গেড়ে বসল। পাশে তার স্ত্রীর কবরভূমি। সে বলল, যীশুরাজ আমার অপরাধ তুমি কখনোই ক্ষমা করবে না জানি। তবু ভয় পাই না। আমার সব কিছুর এত বড় সর্বনাশ হতে দেব না। কোনো পাপ কাজই আজ আর আমার কাছে পাপ কাজ না।

সে এবারে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে দ্বীপময় শুধু বেড়ালের চোখগুলি জোনাকির মতো জ্বলছে। এবং ছুটে লাফিয়ে কি যে করছে। আর ভয়ঙ্কর চিৎকার করছে। প্রায় কান পাতা যাচ্ছে না। নৌকা জলে ভাসাতেই ভালো মানুষের মতো সব কটা বেড়াল নৌকায় লাফিয়ে উঠে গেল। ভয়ে জড়সড় হয়ে পাটাতনের একপাশে প্রকাণ্ড সব ওলের বলের মতো জমা হয়ে থাকল। আজকের রাত এবং কালকের রাত, ছুটো রাত আরও ক্ষুধায় কাতর করে রাখার ইচ্ছে আছে। তারপর সে আশা করছে আজই যে কোনো সময় বড় আকারের একটা হাঙর তুলে ফেলতে পারবে। এবং এ-ব্যাপারে সে ভাবল, সব চেয়ে নির্জীব বেড়ালটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করবে।

সকালের দিকে সে প্রথম তার বড়শিতে দুর্বল বেড়ালটার পেট গেঁথে টোপ ফেলে বাদাম তুলে দিল। এবং সন্ধ্যা হতে না হতেই সে দেখল অতিকায় একটা মাছ আটকে গেছে। সারারাত ওটা ওকে নিয়ে

ঘুরবে। এবং বড়শিতে কিছু বিষ মেশানো থাকে। একদিনেই কাবু হয়ে যায় মাছটা। তারপর গভীর নিশীথে তার কাজ মাছটাকে নিয়ে সমুদ্রের কাছাকাছি মানগান্নু যেখানে শেষ হয়েছে, যেখান থেকে দ্বীপের গভীর বনাঞ্চল, তার নিচে কোনো নীল লেগুনে ঠিক আশ্রয় পেয়ে যাবে। এবং সেই গভীর বনাঞ্চলের ভেতর লেগুনে আত্মগোপন করে থাকলে স্যামসনের বাপেরও সাধ্য নেই টের পায় সে ওখানটায় আটগণ্ডা বেড়াল নিয়ে পালিয়ে আছে। রাতে সে আগুন জ্বেলে মাছ পুড়িয়ে আহারও করতে পারবে। চুরি করে মিষ্টি জলও দরকার মতো নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু সাবিনার কথা মাথায় আসতেই সে কেমন মুষড়ে পড়ল। মানগান্নু থেকে বেশি তো দূর না। সে লেগুনের ভেতর আত্মগোপন করে থাকবে—অথচ সাবিনাকে দেখতে পাবে না ভাবতেই চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। কি রকম আছে কে জানে। সেই ভিনদেশীর জাহাজটা এখনও যায় নি। কারণ মাস্তুলের লম্প দেখে সে বুঝতে পারছে জাহাজটা এখনও আছে।

মাছটা এখনও কাবু হচ্ছে না। যদিও সে জানে মাছটা গভীর জলে ঢুকে গুম মেরে আছে, মাছটা যে কোনো সময় ভেসেও উঠতে পারে, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, মাছটাকে নিয়ে রাত থাকতে থাকতে সেই গভীর বনে কোনো লেগুনের ভেতর ঢুকে যেতে হবে। সে তার পুলিতে কিছু প্যাচ ঢিলে দিল, তারপর আরও কিছু।

আর আশ্চর্য এই নিশীথে বেড়ালগুলো কেবল গোঙাচ্ছে। যেন যে কোনো সময় বাঘের মতো হিংস্র হয়ে যেতে পারে, অথবা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে গলা কামড়ে ধরতে পারে। এদের এতদিন ক্ষুধার্ত রাখার পর একটা বড় হাঙরের অবশ্যই দরকার। এবং সে দেখতে চায় কতটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অতিকায় মাছটাকে আটগণ্ডা বেড়াল সাবাড় করতে পারে। এখন শুধু তার এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বেড়ালগুলো নিয়ে চলছে। আসলে আর আটগণ্ডা পুরো বেড়ালের সংখ্যা নেই। ইতিমধ্যে আরও একটা বেড়ালকে থেতলে মেরেছে এবং হাঙরের টোপ

হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারপর সেই মাছটাকে ডাঙ্গায় ফেলে যখন বেড়াল দিয়ে খাইয়েছিল, বড় বেশি সময় নিয়েছিল খেতে। অতটা সময় নিলে চলবে কেন। আরও দ্রুত ভোজনপর্ব শেষ করা দরকার। নচেৎ মনে হয়, সেতো যাবেই, আবিন চাচা এবং সাবিনা কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

সমুদ্রে যতই অন্ধকার নামুক, নক্ষত্রের আলোতে গভীর রাতেও অনেকটা দূর দেখা যায়। মাছটাকে সে এখন টেনে টেনে তার নিজের দ্বীপটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। খুব সতর্ক সে। এই যা রক্ষে, স্যামসনের মাত্র একটাই মোটর বোট আছে। আর আছে ছটা ঘোড়া। একটা বন্দুক। এরই জোরে সে গোটা দ্বীপটার অধীশ্বর হয়ে আছে। সে নিজেই বলল, শালা মাছের গন্ধে ছাখো কেমন করছে কামারুর বাচ্চারা। ঠিক টের পেয়ে গেছে জন সামসের বড় একটা হাঙর তুলবে। এবং বিনীত বাধ্য, এত বিনীত বাধ্য যে, ওরা দেখল মাছটা ঠিক ডিঙ্গির ওল্টো মুখে পিঠ ভাসিয়ে হা করে আছে। আর লেজ নাড়ছে। বুড়বক আর কাকে বলে, অন্ধকারেই লাফিয়ে পড়তে যাবে, ঘাড় কামড়ে মাংস খাবে, অথচ জন সামসের জানে, গপ করে মাছটা গোটা আস্ত বেড়ালটাকেই গিলে ফেলবে।

ফলে তার এখন দুটো কাজ হয়েছে। একদিকে বেড়ালগুলোকে সামলে রাখা, অন্যদিকে খুব সতর্ক থাকা মাছটা নিয়ে যেতে যেতে যেন ফর্সা হয়ে না যায়। তার দ্বীপের সবাই দেখে ফেলবে। লোকজন ছোটাছুটি লাগিয়ে দেবে আবার জন সামসের বড় কোনো শিকার নিয়ে ফিরছে।

আর তখনই বিস্ময়কর একটা শব্দ তার কানে ভেসে আসতে থাকল। ঠিক যেমন স্যামসনের বোটে শব্দ হয় চলবার সময় প্রায় তার মতো, ঠিক তার মতো বলা যায় না, কম, এবং সমুদ্র শান্ত বলে, আর রাত গভীর বলে শব্দটা কিছুটা অন্যরকমভাবে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ওর চমকে যাবার কথা। কারণ কে এত গভীর সমুদ্রে একটা

বোট নিয়ে চলে এসেছে। কিছু দূর গেলেই সমুদ্রে হারিয়ে যাবে। এ পাশে একটা বোট আসছে, এবং কোনো সংকেত নেই! আর তখনই সেই নৌকা থেকে একটা টর্চের আলো ওর নৌকায় এসে পড়ল। আর সাবিনা, চিৎকার করে উঠল, 'বাবা! বাবা আমরা। আমি আর ভিনদেশী দ্বীপ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি'।

জন সামসের কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কথাটাতে। তার চোখ-মুখ ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। জন সামসের শুধু বলল, আলো জ্বালবে না। একেবারে জ্বালবে না। নৌকায় মাছ আটকেছে। তোমরা এখন আমাকে শুধু সাহায্য কর। মাছটা তোমাদের বোটে বেঁধে দিচ্ছি। মাছের সুতোটা এই বলে সে ভিনদেশীর হাতে ছুড়ে দিল। সহজেই তুমি মাছটাকে টেনে নিতে পারবে। এবং সে আর একটা দড়ি দিয়ে ওর নৌকাটাও বেঁধে ফেলল ভিনদেশীর ছোট্ট ডিঙ্গিটার সঙ্গে। তারপর সে কেন যে এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল বোঝা গেল না। গলা ছেড়ে গান ধরে দিল। মোটর বোটটা সব টেনে সেই মানগান্নু উপত্যকার নীচু অংশের কোনো লেগুনে সকাল হবার আগেই ঢুকে যেতে পারবে। যতই চেষ্টা করুক স্যামসনের সাধ্য নেই এদের তিন জনের কাউকে খুঁজে বের করতে পারে। এটা ভাবতেই তার গলায় গান এসে গিয়েছিল। সাবিনা কাছে আছে, ভিনদেশীও। তার দলটা স্যামসনের চেয়ে কম শক্তিশালী না। আর আছে সঙ্গে সাড়ে সাতগণ্ডা বেড়াল।

॥ চোদ্দ ॥

সকালে দ্বীপে ভয়ঙ্কর একটা সংবাদ ঘরে ঘরে রটে গেল। খবর, সামসেরের মেয়ে একজন জাহাজীকে নিয়ে জাহাজ থেকে রাতেই কোথায় ভেগে গেছে। স্যামসন ঘোড়া ছুটিয়ে প্রথমে গেল সাবিনাদের বাড়ি। এদিকটায় সে অনেকদিন আসে নি। যদি চারপাশে কোথাও থাকে। যদি সেই নেটিভটা বনজঙ্গলে কোথাও পালিয়ে থাকে। দ্বীপটাকে তার এখন খুব বড় মনে হচ্ছিল। লোকবল সামান্য মনে হচ্ছিল।

আবিন চাচার ঘোড়াটাও সরাসরি জিম্মায় চলে এল। ওরা চারজন, প্যাংকো সাহেবও সঙ্গে আছেন। অন্য যে চার পাঁচজন স্বজাতি আছে, তারা খাদের কাজে এতই ব্যস্ত যে স্যামসনের ইচ্ছে হল না ব্যবসার ক্ষতি করতে। ওরা চারজন একেবারে কোনো বন্য শিকারীদের মতো অথবা দূর-দুরান্তের কাউবয়দের মতো কোমরে বেল্ট এঁটে বেরিয়ে পড়েছে। দুটো শিকারী কুকুর সঙ্গে আছে। যত বড়ই হোক, আজ হোক কাল হোক নেটিভটাকে খুঁজে বের করতে পারবে। যাবেটা কোথায়! কাছাকাছি দ্বীপ বলতে মিরাপাস। মিষ্টি জল পাওয়া যাবে না। তারপরের দ্বীপটাতে শুধু বালি আর কাঁটা জাতীয় গাছ। সুতরাং এই দ্বীপের কোনো বনেজঙ্গলে ওরা ঠিক পালিয়ে আছে। বেশ মজাই লেগেছিল স্যামসনের। অনেকদিন থেকেই উত্তেজনা ছিল না কিছু। সব একঘেঁয়ে। ভালো সুন্দরী পাওয়া যাচ্ছিল না, দামী মদ আর ভালো লাগছিল না, সব পুরনো হয়ে যাচ্ছে। ক'দিন আগে সে সুরমাই মাছটাকে দেখতে না পেলে, দ্বীপটা এখনও তার কাছে কত যে রহস্যময় বুঝতেই পারত না। সে দু'বার দু'রকম ভাবে গোঁফ মুচড়ে দিল।

দ্বীপের মানুষদের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। ঘরে ঘরে স্যামসনের লোকজন খোঁজ খবর নিয়েছে প্রথম। কার কপালে কি আছে কেউ বলতে পারছে না। বুড়ো আবিন চাচাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল মানগানু উপত্যকায়। স্যামসনের পায়ের কাছে ফেলে স্বীকারোক্তি করাতে চাইল।

আবিন চাচার হাত পা ছড়ে গেছে। শরীর প্রায় উলঙ্গ করে ফেলেছে। দৃশ্যটা দ্বীপবাসীরা দেখতেও ভয় পাচ্ছিল। দরজা জানালা বন্ধ করে সবাই বসে আছে। যারা কাজের লোক, তারা মুখ বুজে খাদে কাজ করে যাচ্ছে। চারপাশে কোথায় কে কিভাবে চরের কাজ করছে কে জানে! একটা থমথমে ভাব। আবিন চাচা হাত জোড় করে বলল, আমি কিছু জানি না হুজুর। দোহাই যীশুরাজের। সে

বুড়ো মানুষ, তার কপাল পাথরে ঠুকে দেওয়া হয়েছে দু'বার। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। স্যামসন ঘোড়ার পিঠে বসেছিল নির্বিকারভাবে—তারপরই কি খেয়াল হল, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

প্যাংকো সাব বলল, ছেড়ে দাও। আবিন চাচাকে বলল, ঘর থেকে নড়বে না। বলে সেও এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে দৌড় লাগাল। মানগানু উপত্যকা দীর্ঘ এবং লম্বা। আর দ্বীপে সমতল জায়গা বলতে এটাই। দ্বীপটার চারপাশে কোনো রাস্তা নেই। কেবল বড় বড় পাথরের পাহাড়, কোথাও বনের গভীরে সূর্যালোক পর্যন্ত ঢুকতে পারে না। কেবল মানগানু উপত্যকা দিগন্তবিস্তৃত মাঠ নিয়ে পড়ে আছে। ঘোড়াগুলো সকালের দিকেই চোখের ওপর ক্রমে কেমন বিন্দুবৎ হয়ে আসতে লাগল।

আর মানগানু উপত্যকা ব্যতিরেকে কোথাও ঘোড়ায় চড়ে ছোটা যায় না এ দ্বীপে। রংকি উপত্যকাটা খুবই ছোট। কোয়ার্টার মাইল পাকা রাস্তা। দু' ধারে ইউক্যালিপ্টাসের গাছ লাগিয়ে কোনো সমুদ্র-সৈকতাবাসের মতো করে নেওয়া হয়েছে। এবং স্যামসনের মনে হল, সামনের গভীর বনটা কতটা কিভাবে ও-পাশের সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে সঠিক সে জানে না। ঘোড়াগুলো এখানে ছেড়ে দেওয়া হল। বুড়ো ঘোড়াটা আর তেমন ছুটতেও পারে না। সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে, উঁচু নিচু খাদের মতো জায়গাগুলো। বনের গভীরে ঢুকতে হলে, কেবল মাত্র হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। ভেতরে কিছু দূর ঢুকতেই মনে হল, সূর্য মাথার ওপর হেলে গেছে। আর ভেতরেও ঢোকা যাচ্ছে না। নিবিড় বনজঙ্গলের ভেতর লতাপাতা, আর কীটপতঙ্গের ভয়ংকর আশ্চর্য সব শব্দে সে কিছুটা বুঝি আতংকিতও হয়েছিল।

বড় বড় সব ইউকন গাছগুলো মৃদু গভীর কথাবার্তা বলছে যেন। মাঝে মাঝে পাতার খস খস শব্দ। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ভয়ংকর ভৌতিক কিছু চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে। স্যামসন যতটা সহজ ভেবেছিল দ্বীপটাকে, এতদিন পর মনে হয়েছে, না, খুব সহজে দ্বীপের

পূর্ব দিকের সমুদ্রে চলে যাওয়া যাবে না। আরও লোকজনের দরকার। বন্যলতা গাছে গাছে এ-ভাবে জড়িয়ে আছে যে কিছুটা প্রায় দেওয়ালের মতো কাজ করছে। বরং হেঁটে দ্বীপটাকে একবার ঘুরে দেখা যেতে পারে। আর কি কি উপায় থাকতে পারে একটা বড় পাথরের ওপর বসে স্থির করা গেল। যেমন ঠিক হল দ্বীপটার সব চেয়ে বড় টিলাতে কেউ পাহারায় থাকবে। দূরবর্তী কোনো জঙ্গলে, অথবা সমুদ্রের কাছাকাছি আগুন অথবা ধোঁয়া উঠতে দেখলে, নিশ্চিত ভাবা যাবে, শয়তান ছ'টো সেখানে লুকিয়ে আছে। যতই কঠিন হোক, তাদের সে জায়গাটা তখন খুঁজে বার করতে হবে।

এ-ভাবে ওরা বোট নিয়ে দ্বীপের চারপাশটা ক'দিন ধরে ঘুরে দেখল। কিছু নেই। কোথাও কচ্ছপেরা রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে, কোথাও বড় বড় শামুকের কংকাল পড়ে আছে পাথরের খাঁজে খাঁজে। কোথাও ঝাঁক ঝাঁক পাখি বোটের শব্দে ভয় পেয়ে সমুদ্রে উড়ে গেল। অথবা দ্বীপের বাঁদরগুলো ফলের লোভে সব এদিকটায় চলে এসেছে।

দ্বীপের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বোঝা গেল, নেই, কোথাও নেই, কেবল সেই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বনের গভীরেই পালিয়ে থাকতে পারে, এবং কেবল সেখানেই তন্ন তন্ন করে খুঁজলে ঠিক সন্ধান পেয়ে যাবে। সাত আট দিনের মাথায় সকালে যেমন ঘোড়াগুলো সমুদ্রের ধারে ধারে বনের গভীরে চলে যায়, ওরা সেদিন তেমনি যাচ্ছিল। বড় একটা খাদ পার হওয়া যাচ্ছিল না। কাঠের সাঁকোটা বানাতে গেছে তিন চার দিন। সাঁকোটা পার হয়ে গেলে, বনের প্রায় গভীরে ঢুকে যেতে পারবে। লোকজন নিয়ে এসে গাধার পিঠে কাঠ চাপিয়ে দড়ি-দড়া পেরেক হাতুড়ি চাপিয়ে কাঠের সাঁকোটা বানাতে বেশ তিন চারদিনই লেগে গেছিল। স্যামসন নতুন উদ্যমে ফের খোজাখুঁজির জন্য ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। বুড়ো ঘোড়ার পিঠে, হেলেদুলে চলে এসেছে। দুপুরের খাবার সঙ্গে। বেশ একটা নতুন মজা পেয়ে গেছে। শিকার এখানেই ঠিক মিলবে সে বুঝতে পারছিল। এবং বন্দুকের

নল, ভালো করে রাতে সাফসোফ করে রেখেছিল। হাভার্ডের জাহাজ সেদিনই চলে গেল। হাভার্ড লোক দিয়ে খবরে জানিয়েছে, সকালে আর ওদের দেখা যায় নি। সে দুপুর পর্যন্ত ছিল, এবং তখনও যখন পাওয়া যায় নি, লগবুকে শুধু সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। মাস দু'তিনের ভেতরই আবার ফসফেট নিতে আসবে জাহাজ, তখন কিছুটা জোর খোঁজাখুঁজি চলবে। তার আগেই খুঁজে বের করা দরকার এবং কুটুমবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে!

বোটে কাছাকাছি দ্বীপগুলোতেও খুঁজে দেখেছে। নেই। আসলে কার সাহস আছে এভাবে একটা দ্বীপে বাস করার! সুতরাং এ দ্বীপেই আছে। মানগান্নু উপত্যকার নিচে উষ্ণ প্রস্রবণের জল গড়িয়ে যখন দূরবর্তী সমুদ্রে পড়ে তখন ভারি ঠাণ্ডা শীতল জল। এবং শীতল জলের জন্য কখনও না কখনও একবার আসতেই হবে। পাহারায় আছে তিরপিতির। আজকাল খুব বাধ্যের হয়ে মতো গেছে। তবে এই প্রথম স্যামসন বুঝতে পারছে, দ্বীপটায় তার লোকবল তেমন মজবুত নয়। প্রস্রবণের জল সবাই তুলে নিয়ে যায়, জল ঝরণার মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে অনেকটা পথ, আর এত সব বাঁক আছে মাইল খানেকের ভেতর, যে দু'দশ গজের ভেতরও কেউ পালিয়ে থাকলে টের পাওয়া যায় না।

ঘোড়াগুলো ছেড়ে দেওয়া হল। প্যাংকো সাহেব আগে, কুকুর দুটো আরও আগে। পেছনে ছকুন। মাঝখানে স্যামসন। গোঁয়ার সামসেরটাও ফিরে আসে নি। কোথায় গেল সব। এবং আবিন চাচাকে রোজ সকালে সামসের ফিরেছে কিনা খবরটা পৌঁছে দিতে হচ্ছে। স্যামসন ঘোড়া নিয়ে বের হবার মুখেই দেখতে পায় বুড়ো লোকটা প্রায় তার প্রাসাদের নিচে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং একই খবর, সমুদ্র থেকে এখনও ফেরে নি। আর হিসেব করে দেখল প্রায় বারো দিন হয়ে গেল, সামসেরের কোনো পাত্তা নেই।

সে যেতে যেতে বলল, প্যাংকো, তোমার কি মনে হয়, সামসের ওদের নিয়ে ভেগেছে ?

—সে কি করে হবে স্যার। ও তো জাহাজ ছাড়ার দু'দিন আগেই চলে গেছে মাছ ধরতে।

বোধহয় এত ক্ষেপে গেছে প্যাংকোর ওপর যে সে বাস্টার্ড বলে গাল দিত। কিন্তু খুবই ধূর্ত বলে দুঃসময়ে আর কাউকে চটাতে চাইছে না। এটা মনে হচ্ছে স্যামসনের দুঃসময়ই। তার নাকের ডগায় সামসেরের এত বড় দুঃসাহস, নেটিভ ইণ্ডিয়ানটার আস্পর্ধা, আর প্যাংকোর মতো লোকের জাহাজ থেকে একা ফিরে আসা, সময় খারাপ না হলে এতগুলো বিরুদ্ধাচরণ একসঙ্গে ঘটবে কি করে! সে বুঝতে পারছে, খুব চতুর হতে হবে এখন। বনের খেলাটা শেষ হলে প্যাংকোকে আসল খেলাটা দেখাবে।

সে বলল, আচ্ছা প্যাংকো, তোমার কি মনে হয়!

—আমার তো মনে হয় স্যার ওরা এখানেই আছে।

—আরে সে কথা নয়। সামসেরের কথা বলছি।

—ও তো সমুদ্রে গেছে।

—সমুদ্রে কেউ এত দিন থাকতে পারে!

—তা তো সত্যি কথা স্যার!

—তোমার কি মনে হয় না, সামসের তলে তলে কিছু একটা করছে ?

—অবশ্যই করতে পারে।

কথা শুনলে পাছায় লাথি মারতে ইচ্ছে করে। বেশ অনেকটা উঠে এসেছে ওপরে। আগের মতো পথ আর খুব বিপদসংকুল নয়। ইলাদ বেশ দু'পাশে ঝোপঝাড় কেটে সাঁকো পর্যন্ত রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে। কখনও কিছুটা হেঁটে কখনও পাথরে পাথরে ডাই মেরে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে এখন এই সাঁকোটা পর্যন্ত অনায়াসে আসা যায়। প্যাংকোর সঙ্গে কথা বলেও সুখ নেই। সে যা বলবে তাই সায় দিয়ে যাবে। নিজে বুদ্ধি খরচ করে কোনো জবাবই দেয় না।

এতদিন মনে হয়েছিল, প্যাংকোর মতো সরল সহজ লোক হয় না! বিশ্বস্ত লোক হয় না। এখন মনে হচ্ছে, তুনিয়ার সবচেয়ে বড় আহম্মক-টাকে সে পুষে রেখেছে। বিপদে আপদে যে একটু সলাপরামর্শ করবে তারও উপায় নেই।

সাঁকো পর্যন্ত এসে চারজন চারদিকের ঝোপজঙ্গলে ঢুকে গেল। কিছুটা এসে স্যামসন বুঝতে পারল, তুর্ভেদ্য বনজঙ্গলে খুব বেশি দূর এগুতে পারবে না। সে একটা গাছের কাটা ডাল ভেঙ্গে চিহ্ন রেখে দিল। কতদূর পর্যন্ত সে এসেছিল তার চিহ্ন। তারপর ফিরে সাঁকোটার ওপর বসে পড়ল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে—খেয়ে নেওয়া যাক। ফ্লাস্ক থেকে কিছুটা চা ঢেলে রোস্ট করা কচ্ছপের মাংস গিলতে থাকল। আর ভেতরে সেই বালিকার মুখ কেবল উঁকি মেরে যাচ্ছে বার বার। সামসেরের ধূর্ততার কাছে হেরে গেল! সময় দেওয়া ঠিক হয় নি। উচিত ছিল, সেদিনই রংকিতে নিয়ে আসা। তা হলে এমন একটা ঝামেলা হুজ্জোতিতে পড়তে হত না।

ওরা এক সময় ফিরে এল। বলল, হুজুর বনজঙ্গলের অত স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক হয় নি। যে যার মতো ডালপালা মেলে দিয়েছে। একটু যদি রাস্তা রাখত।

স্যামসন খুব গর্বিত মুখে সবার দিকে তাকাল। যীশুরাজের পরই সে এ-দ্বীপের সব। নিজেকে তার চেয়েও সবল ভেবে ফেলে যখন, কেমন শংকা জাগে। রাতে গীর্জায় বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, এবং তিনবার কানমলা খায়—আর এমন মনে করব না প্রভু। আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। এবং সে যেহেতু সব অপকর্মই যীশুরাজের ইচ্ছে ভেবে থাকে, অথবা মনে যখন শংকা জাগে, বেদীর সামনে বসে প্রার্থনা করে এবং বলে, আপনারই ইচ্ছে সব। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। সে সহজেই তার কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতে পারে বলে, কোনো অনুশোচনাই থাকে না। আর একটা পাপকাজ করার সময় ভাবে তিনি তো আছেনই। ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে।

অথবা এত বড় যে গীর্জাটা তৈরি হল, সে কার টাকায় ? সে না থাকলে, এমন একটা জনমানবহীন দ্বীপে যীশুরাজের হয়ে কে কাজকর্ম চালাত ! কারণ সে এ দ্বীপে মানুষের জন্ম থেকে বিবাহ এবং মৃত্যুতে পাদ্রীর করণীয় কাজটুকুও করে দেয়। এই সবই তাকে সহজেই একজন শয়তান করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

এবং প্রায় অভিযানকারী পুরুষের মতো সন্ধ্যা হলেই হুইস্‌ল্ বাজিয়ে দেয়। মানগানু উপত্যকার নিচে, যেখানে ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে এসেছে, এবারে সেখানে নেমে যাওয়া দরকার। নক্ষত্রের আলো ব্যতিরেকে আর কোনো আলোর উৎস খুঁজে পাওয়া ভার। টর্চের আলোয় বেশি দূরে কিছু দেখা যায় না। কেবল গাছপালা এবং কীট-পতঙ্গ উড়ে বেড়ায় তখন সামনে।

ওরা নিচে অন্ধকারে নেমে দেখল একটা ঘোড়াও নেই। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। এই মাঠেই সে ঘোড়াগুলো ছেড়ে গেছে। ইলাদ মুখে একরকম আওয়াজ করল। আওয়াজে ঘোড়াগুলো যেখানেই থাকুক ডেকে উঠতে পারে। স্যামসন টর্চ জ্বেলে নিচে ওপরে বড় বড় পাথরের পাশে তার ঘোড়াগুলোকে খুঁজতে থাকল। এমন তো হওয়ার কথা না। শিকারী কুকুর দু'টো মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়িতে। ফসফরাস জ্বলে উঠছে আগুনের মতো। সে চিৎকার করে উঠল, তোমরা কে কোথায় আছো ?

অনেক দূর দূর থেকে তিন রকমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—পেলে ?

—না…এই ধরনের প্রতিধ্বনি উঠল দ্বীপে।

আর তখনই তার হাতের টর্চটা পড়ে গেল। হাত থর থর করে কাঁপছে। টর্চ সে ধরে রাখতে পারে নি। আলো নিভে গিয়ে এক মহাশূন্যে ঝুলে আছে মনে হল। এবং ওর আর্ত চিৎকারে প্যাংকো দৌড়ে কাছে এলে বলল, ঐ ছাখো !

ওরা সবাই দেখল, একটা মৃত ঘোড়া। ঠিক ঘোড়া আর বলা যায় না। হাড়-পাঁজর বের করা কংকাল। এইমাত্র যেন ওর ছাল-চামড়া মাংস খুবলে খেয়ে গেছে কেউ।

স্যামসন চোখ বুজে ফেলেছিল ভয়ে। ওরা কাছে আসতেই তার মনে হল, সে স্যামসন। দ্বীপটাতে এ-হেন অশুভ হত্যা সে জীবনেও দেখে নি। গা শিউরে উঠছে। এবং ওরা পায়ে পায়ে চারজন, কংকালটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল একবিন্দু রক্ত পর্যন্ত নেই, এমন চেটেপুটে খাওয়া।

স্যামসন বোধহয় সংজ্ঞা হারাত। কিন্তু যা হয়, কোনো বিপদের সময় সে দেখতে পায় মাথায় তিনি হাত রেখেছেন। বলছেন, বিপদে ভয় পাওয়া পাপ। তার সব সাহস ফিরে পায় অতি আয়াসে। উঠে দাঁড়ায়। প্রবল বিক্রমে তখন সে ফের ছুটতে পারে। কোনো রহস্যময় হত্যাই তখন মনে হয়না ভয়ের।

রাতে সে তার বাংলোয় ফিরে আসতেই শুনল, তিনটে ঘোড়া ফিরে এসেছে। বুড়ো ঘোড়াটা ফিরে আসে নি।

স্যামসন শুধু প্যাংকোকে ডেকে বলে দিল, ঘোড়ার আস্তাবলে পাহারা বসাও। তোমরাও সাবধানে থাকবে। যেন এক অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে পড়ে গেছে। বরং রাতেই পোশাক পাল্টে একজন প্রিয় ধর্মযাজকের পোশাক পরে ফেলল। তারপর সারারাত বন্দুক পিঠে যীশুর বেদীর ওপর প্রার্থনার ভঙ্গীতে পড়ে থাকল। ঈশ্বরের কাছ থেকে সে সাহস এবং শৌর্য ভিক্ষা করে নিল। কারণ সে কিছুতেই এমন একটা বিসদৃশ ঘটনায় ভেঙ্গে পড়বে না। বিশ নম্বর কুটিরে তাকে আলো জ্বালাতেই হবে।

সকালে সবাই দেখল ফের গীর্জা থেকে ঘোড়ায় চড়ে স্যামসন ফিরছে। প্রায় একজন তাজা মানুষের মতো। ধর্ম মানুষকে কত রকমের সঞ্জবনী সুধা দিয়েছে!

॥ পনের ॥

ছ'টা ঘোড়ার ভেতর একটা ঘোড়া কমে গেল। আবার চারটে ঘোড়া এবং ওরা চারজন। ওদের ধারণা যদি দ্বীপে নেটিভটা থেকেই যায় এবং যখন সাধারণ বুদ্ধিতে কিছুতেই নিরুদ্দেশ হওয়া মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, তখন একমাত্র দ্বীপের পূর্ব দিকটাই ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার। দ্বীপের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে এই পূর্বাঞ্চল। উঁচু-নিচু পাথরের পাহাড় আর টিলা, কখনও এক ধরনের লম্বা ঘাস অথবা বড় বড় ইউকনের গভীর জঙ্গল দিগন্তব্যাপী।

ওরা দ্বীপটার এই অঞ্চলের একটা মানচিত্র তৈরি করতে চায় তখন। কেথায় কিভাবে বনটা আছে এবং যদি কোনো ফসফেটের পাহাড় আবিষ্কার করে ফেলতে পারে, তবে একসঙ্গে দুই কাজ হয়ে যাবে। আর মনে মনে স্যামসন বালিকার জন্য খুবই অধীর হয়ে পড়েছে। লম্বা টানা টানা চোখ, এক রাশ বাদামী চুল, লাবণ্যময় মুখ, কি যে অসামান্য লোলুপতা সৃষ্টি করছে! যত দিন যাচ্ছে, সে অস্থির হয়ে উঠছে। ফেরার সময় গালাগাল করছে প্যাংকোকে। দুঃসময় বলে চাবকাতে পারছে না। তা না হলে চাবকে ছাল-চামড়া তুলে নিত। বিশ্বাসও করতে পারে না, যদি দ্বীপে ওর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী গড়েই ওঠে তবে কখন আবার এই সব নচ্ছার লোকগুলো হাত মেলাবে কে জানে। সে-জন্য সে সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। এবং দামী আগ্নেয়াস্ত্রটা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না।

ওরা সাত আট দিন এ-ভাবে এসে প্রতিদিন বন এবং ঘাসের উপত্যকায় খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হলেই ফিরে যেতে হয়। ঘোড়াগুলো পাহারা দেবার জন্য বেলাভূমিতে দু'জন লোক থাকছে।

কিন্তু আট দিনের মাথায় স্যামসন দেখল, হুইস্‌ল্ বাজাবার পরও একজন ফিরে আসছে না। যেমন চারজন চারদিকে ঢুকে যায় গভীর

বনে, আজও তাই করেছে। খাবার দাবার সঙ্গেই দিয়ে দেয়। দা দিয়ে লতা ঝোপ কেটে খুব একটা বেশিদূর কেউ যেতে পারে না। এ-ভাবেই ওরা প্রায় সাঁড়াশী আক্রমণের মতো এগিয়ে যাচ্ছিল। আর কিনা তখন, একজনের হদিস পাওয়া গেল না সন্ধ্যায়। সে বারবার হুইস্‌ল্‌ বাজাতে থাকল।

গভীর বনে রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারে। সে জোরে জোরে বাজাতে থাকল। ভিতরে অবিশ্বাস ও সংশয় ওকে পাগল করে তুলেছে। জোরে জোরে তারপর চিৎকার করতে থাকল। শুধু প্রতিধ্বনি, আর কোনো শব্দ সে এই নির্জন পৃথিবীতে শুনতে পেল না।

প্যাংকো আর ইলাদকে অগত্যা টর্চ হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল ভেতরে। যে দিকটায় কামারু গেছে, ঠিক সেই পথে ওরা এগিয়ে গেল। খুব বেশিদূর যেতে হয় নি। মাইলখানেক ভেতরেও হবে না। ওরা দেখল, কামারু উবু হয়ে পড়ে আছে। ওর গলা থেকে খুবলে মাংস তুলে নেওয়া। চেটেপুটে শরীরের রক্ত শুষে খেয়ে গেছে। প্যাংকো বোবার মতো তাকিয়ে দেখল। ইলাদ বোধহয় ভিরমি খেত। দ্বীপে এমন নৃশংস মৃত্যু সে কখনও দেখে নি। সাদা পাণ্ডুর মুখে ইলাদ চিৎকার করে উঠতে চাইল! আশ্চর্য, শুধু একটা ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ, বোধহয় সে ভিরমি খেয়ে পড়েই যেত, তখন প্যাংকো ঈশ্বরের নাম নিল ক'বার। সঞ্জীবনী সুধা রয়েছে ঈশ্বরের নামে। ইলাদ আর ভিরমি খেল না। লাশটা কাঁধে ফেলে বের হয়ে এল তারা। স্যামসন নিষ্ফল আক্রোশে চিৎকার করে উঠল, দ্বীপে শয়তানের রাজত্ব চলতে দেব না। এবং মনে মনে সে এতই ভয় পেয়ে গেছিল যে, দু'বার গভীর বনের উদ্দেশে অহেতুক ফায়ার করে বন্দুকটাকে ফের বগলদাবা করে ফেলল। বালিয়াড়ি পর্যন্ত টেনে আনা হল সেই লাশটাকে। তারপর সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবার সময় মনে হল গভীর বনে আগুন জ্বলছে। কিন্তু এতই বিচলিত আর ভীত যে আগুনটাকে অনুসরণ করা কারো সাহসে

কুলালো না। ওরা ঘোড়ায় চেপে বসল। নিজের প্রাণ নিয়ে উধাও হতে না পারলে যেন সবকিছু আগুন নিমেষে গ্রাস করে নেবে।

আর পরদিনই দেখা গেল স্যামসন খুব অসুস্থ। ভয়ে ভয়ে সবাইকে দেখছে। যেন এক অদৃশ্য শয়তানের লম্বা হাত দেখতে পাচ্ছে, দ্বীপের পূর্বদিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাত দু'টো এত লম্বা আর অতিকায় যে, সেই হাত দু'টো মাইলের পর মাইল লম্বা হতে হতে আকাশে উঠে যাচ্ছে। তারপর সোজা ডিঙ্গি মেরে হাত দু'টো নেমে আসছে নিচে। ওর জানালায় ঝুলে থেকে আঙ্গুলগুলোকে নাচাচ্ছে। সে চিৎকার করছিল, মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল। তোমরা কে কোথায়! বাঁচাও বাঁচাও। প্যাংকো সব বুঝতে পারল, স্যামসনকে ভূতে ধরেছে। অথবা কামারুর প্রেতাত্মার ভয়ে এমন করছে। সে নিজেই পাদ্রীর মতো পোশাক পরে এল। তারপর বাইবেল থেকে কিছু পাঠ করে শোনাল। এবং তখনই দেখতে পেল স্যামসন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। ভয় ওর বিন্দুমাত্র নেই। প্যাংকোর কাজ হয়ে গেল, ক'দিন কেবল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইবেল পাঠ। এবং এক সকালে স্যামসন ফের বন্দুকটা কাঁধে ফেলে, ঝোলায় একটা বাইবেল নিয়ে তিনজন সঙ্গীসহ সেই আগুন এবং শয়তানের উদ্দেশে বের হয়ে পড়ল।

দ্বীপের লোকগুলো বলাবলি করল, স্যামসনের সঙ্গে লড়ে কোন শয়তানের সাধ্যি।

দ্বীপের লোকগুলো আরও বলাবলি করল, সাবিনা, সামসের আর ঐ ভিনদেশীটা দ্বীপের কোথাও ঠিক আছে। ওরা পালিয়ে কোথায় আর যাবে! এবং ঐ যে আগুন দেখে স্যামসন ভয় পেয়েছিল, ওটা ঠিক ওদেরই আগুন। কতদিন হয়ে গেছে, দ্বীপে এ ধরনের নৃশংস মৃত্যুর খবর কেউ পায় নি। স্যামসনের আগ্নেয়াস্ত্রটা যতবারই কোনো খুনখারাবি করেছে, কেউ টের পায়নি, শুধু দু'বার ভূমিকম্পের মতো আওয়াজ, এবং কার গলা গেল ঠিক ওরা অনুমান করতে পারত।

তারপর সমুদ্রের জলে ভাসতে দেখা যেত এক আধবার, তারপর আর দেখাই যেত না। কিন্তু একটা ঘোড়ার মাংস খুবলে খাওয়া, রক্ত শুষে খাওয়া, একটা মানুষের গলা থেকে নলের মতো সব রক্ত বের করে নেওয়ার কথা জীবনেও তারা শোনে নি। কোনো অপদেবতার কাজটাজ হবে। আবিন চাচার এখন কাজ সবাইকে সাহস দেওয়া। সকালে সে উঠেই সাবিনাদের বাড়ি চলে আসে, মুরগিগুলো ছেড়ে দেয় খাঁচা থেকে, গরুটাকে ওর ঘোড়া এবং গাধার সঙ্গে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যায়। রাতে ভয়ে ঘরের বার হয় না কেউ। সে রাতে লণ্ঠন জ্বেলে ঘরে ঘরে সাহস ফেরি করে আসে। এবং সকালেই দেখতে পায় চারজন ঘোড়সোয়ার আবার যাচ্ছে! ইলাদ, ছকুন, প্যাংকো আর স্যামসন নিজে। কাঁধে বন্দুক, কোমরে বেল্ট আঁটা, পিঠে কিড্-ব্যাগ। তখন সূর্য উঠে আসে টিলার মাথায়। কেউ জানে না আবার কি ঘটবে!

কামারুর বিবি দু'দিন ঘরের দাওয়ায় বসে থাকল। দু'দিন কিছু খেল না। কামারুর জন্য সে দু'রাত ভেউ ভেউ করে কেঁদেছে। একজন পুরুষ মানুষ সঙ্গে না থাকলে যা হয়। তিনদিনের দিন গীর্জায় গেল স্নান সেরে। এলোচুলে। পাষাণে মাথা ঠুকে দুবার দু'বিন্দু রক্ত বের করল। তারপর ফিরে এসে আবার স্নান, কিছু স্বজাতিকে খাওয়ানো, এবং আট দশ দিন গেলে শোক থেকে কিছুটা নিরাময় হয়ে উঠলেই দেখতে পেল ঘোড়ায় চড়ে চারজনের বদলে তিনজন ফিরে আসছে। ওরা খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ওরা রংকি উপত্যকায় নেমে ঘরে ঘরে খবর পেঁৗছে দিয়ে গেল, স্যামসনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বনের গভীরে আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়েছিল, তখন ওরা তিনজন তিনদিকে। প্যাংকো স্যামসনের রাস্তাটায় ঢুকে দেখেছিল ওর বেল্ট, টুপি কেবল পড়ে আছে। এবং আর যা দেখেছিল, ভয়ে একটা কথা নেই মুখে, কি দেখেছে! যে যেখানে ছিল, খাদে, অফিসে, কুটিরে সবাই উঠে এসে একসঙ্গে প্রায় কোনো ধর্মযুদ্ধের মতো

জিগির দিয়েছে, কি দেখলেন বলুন। তারপর আর কি দেখলেন! দ্বীপে ওটা ঈশ্বর না শয়তান।

প্যাংকো বলল, বুঝতে পারছি না। ঈশ্বরও হতে পারে, শয়তানও হতে পারে।

ওরা যেন আরও বলতে চাইল, শয়তানের সঙ্গে শয়তানের কোনো শত্রুতা থাকে না। ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানের শত্রুতা থাকে।

আবিন চাচা একটা পাথরে বসে তামাক খাচ্ছিল। এতবড় একটা বিপদে এই মানুষটাকেই বিচলিত দেখাচ্ছে না। এবং যা হয়ে থাকে, ছেলে-বুড়ো জোয়ান-মদ্দ সবাই মিলে ঠিক করে ফেলল, সেখানে আগামী কাল সকালে সবাই মিলে যাত্রা করবে। আবিন চাচা বুড়ো মানুষ, তাকে বলা হল, ঘোড়ায় চড়িয়ে নেওয়া হবে। এবং দু' একদিন যদি সেই বনটার পাশে রাতও কাটাতে হয়, তবু তারা রাজী। শয়তানের হাত থেকে দ্বীপটাকে রক্ষা করতেই হবে।

দ্বীপে যারা বালক, অথবা শিশু, কেবল তারা থাকবে, বাকি সবাইকে যাত্রা করতে হবে। সাতটা ছাগল সঙ্গে নিতে হবে, কারণ সেখানে মাংস পুড়িয়ে খাওয়ার দরকার হবে। এবং প্যাংকো বলল, জলের দরকার নেই। বনের গভীরে একটা হ্রদ আবিষ্কার করা গেছে। স্যামসনের টুপি পাওয়া গেছে হ্রদটার কাছেই। ওটাই আমাদের ফ্রণ্ট। ঐ হ্রদটার কাছাকাছি শয়তানের আস্তানা রয়েছে বোঝাই যাচ্ছে।

যদিও খুব সাহসের সঙ্গে বলে যাচ্ছিল প্যাংকো কিন্তু যা একখানা কঠিন দৃশ্য দেখে এসেছে, তারপর মনে আর সাহস থাকার কথা না। স্যামসনের গলা থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে, ওর পেটের সবটাই ফাঁকা, এবং নাক কান সব কিসে চিবিয়ে খেয়েছে—স্যামসন নেই এমন কথা বলতে প্যাংকোর সাহস হল না। আসলে ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। স্যামসনের মতো একটা লাশ দেখে ফেলেছে। তারি একটা বিভ্রমের ভেতর সে যেন পড়ে গেছে। স্যামসন নেই জানলে, যা সব বন্য এই দ্বীপের মানুষেরা, একদিনেই তাদের আবাস তছনছ করে দেবে,

এমন কি আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আর যদি একবার টের পেয়ে যায়, শয়তানের চাবিকাঠি স্যামসন নেই তবে সবকটাকে তাদের পুড়িয়েও মারতে পারে। কাজেই স্যামসনের লাশ দেখার পর বনের গভীরে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। একটা বড় আকারের নীল রঙের মাছি ওর মুখের ভেতর বন বন করে উড়ছিল, বসছিল, সে তা দেখতে দেখতে ঈশ্বরের স্মরণ নিয়ে পিছু হটছিল, তারপর বাইরে এসে বলেছিল, ছকুন আর ইলাদকে, না নেই। কোথাও নেই। ডাকো। জোরে, আরও জোরে। হুইস্‌ল্‌ বাজাও। জোরে আরও জোরে। দেখবে হঠাৎ কখন কোথা থেকে বের হয়ে আসবেন। দুনিয়াতে স্যাসনের সমকক্ষ আর কেউ নেই হে! বিবেচক মানুষ হলে বুঝতে পারত, মরেও রেহাই দিয়ে যায় নি প্যাংকোকে। প্যাংকো অভ্যাস বশে তখনও তেলাচ্ছিল, স্যামসনের গৌরবগাথায় মুখর হয়ে উঠছিল।

সকাল সকাল, সূর্য না উঠতে একটা ক্যারাভ্যানের মতো দ্বীপবাসীরা মানগানু উপত্যকা পার হয়ে বনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। দা, কুড়ুল, বর্শা যে যা পেরেছে সঙ্গে নিয়েছে। প্যাংকো গাধার পিঠে দু'বস্তা মিষ্টি আলু চাপিয়ে নিয়েছে। প্যাংকোর ভাই, ক্লাসারাঙ্কাও যাচ্ছে সঙ্গে। কেবল আবিন চাচা ঘোড়া পেয়েছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছে তিরপিতির। এমনিতে দু'ক্রোশের মতো পথ, কিন্তু ঘুরে ঘুরে যেতে হয় বলে দুপুর গড়িয়ে গেল। প্যাংকো সাব যেতে যেতে বুঝতে পারছিল, মাথার ভেতরটা ভীষণ কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। স্যামসন নেই একথা কিছুতেই বলা যাবে না। সে আছে। তাকে আমরা খুঁজে পেতে বের করতে যাচ্ছি। এবং যাবার সময়, মরা ঘোড়াটার কথা এত ইনিয়ে বিনিয়ে বলছিল, কামারুর নাকের ভয়ংকর চেহারার কথা এত রসিয়ে রসিয়ে গল্প করছিল যে, দিনের বেলাতে সবাই ভূতে পাওয়ার মতো হাঁটছিল! একটাও কথা বলছিল না কেউ, বনটার যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, তত কারো কারো বার বার মলমূত্র ত্যাগের বেগ পেয়ে গেল।

প্যাংকো বুঝতে পারছিল, রসিয়ে রসিয়ে বলাটা বেশ কাজ দিচ্ছে। আর যত কাজে আসছে ফন্দি-ফিকির, তত মাথায় কুট কুট কামড়ানি বেড়ে যাচ্ছে। স্যামসনের খোঁজে কেউ বনের ভেতর ঢুকতে সাহসই পাবে না। তবু সে ভীষণ বিশ্বস্ত লোকের মতো কাজ করে যাচ্ছে। কারণ স্যামসন মরে গেছে, তাকেও মেরে গেছে। বন্দুকটা কোথাও সে কাছেপিঠে দেখে নি। অবশ্য ভালো করে দেখাও হয় নি। আসলে সে একা যেতে ভয় পাচ্ছে, ছকুন-ইলাদকে নিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছে, সব দ্বীপবাসীদের পাহারায় রেখে, বনের গভীরে, স্যামসনের কাছাকাছি বন্দুকটা খুঁজবে। এতদিনে সেই ভিনদেশী, সামসের, সাবিনা বেঁচে থাকলে ঠিক দেখা যেত! আগুনটা জলীয় গ্যাস ট্যাস হবে। সে মরিয়া হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কেবল সেই আগ্নেয়াস্ত্রটা থাকলে দ্বীপটার সে হর্তাকর্তা হয়ে যাবে। তখন সব কুটিরগুলোর বাবু সে একা। ভাবতে ভাবতে জিভে জল এসে গিয়েছিল তার। সে তারই ভেতর দু'বার হাঁটু মুড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, প্রভু, এটা পাইয়ে দিন। প্রভু, তবে আপনার পূজার কোনো ব্যাঘাত হবে না। আমি তো কেবল আপনারই দাস প্রভু। যা কিছু সবই তো আপনার প্রভু। আমাকে কেবল ওটা পাইয়ে দিন প্রভু। তারপর আপনি যা আজ্ঞা করবেন, নফর সব তামিল করবে প্রভু। প্রভু প্রভু প্রভু! একেবারে বিগলিত ধারা, চোখের জল দু' গাল বেয়ে ধরণীতে স্যাৎ স্যাঁতে হয়ে গেল মাটি। তাকে এখন কিছুতেই আর ধর্মপ্রাণ না ভেবে উপায় নেই।

বনের ভেতর এখন প্যাংকো একা। খস খস শব্দ শুনলেই বল্লমটা শক্ত করে চেপে ধরেছে। লাশটার কাছাকাছি কোথাও খুঁজে দেখার জন্য ছকুন-ইলাদকে নিয়েছে। কোনো পচা দুর্গন্ধও পাচ্ছে না। সে ঠিক পথ চিনে আসতে পেরেছে কিনা, তা না হলে সেও আর একটা স্যামসন হয়ে যাবে।

ওরা সব বন্যলতা ডিঙিয়ে যাচ্ছে, ঘাস-পাতা মাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন জায়গা যে সূর্যালোক ঢুকতে পারে না। গভীর অন্ধকারের মধ্যে

কিছুটা যেন হাতড়ে চলা। এবং হ্রদের পাড়ে এসে বুঝতে পারল সে ঠিক ঠিকই এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য! স্যামসনের লাশটা সেখানে পড়ে নেই। পচা গন্ধটন্ধ উঠছে কি না, নাকে শুঁকে টের পাবার চেষ্টা করল। এবং ভয়ের কথা মনে হলেই ঈশ্বরের কথা মনে হয়। তখন নিজেকে খুবই ঈশ্বরের আস্থাভাজন ব্যক্তি ভেবে ফেলে। আর বিন্দু-মাত্র ভয় থাকে না। সে টর্চ জ্বালিয়ে বুঝতে পারল, একা এ-ভাবে খোঁজা ঠিক হবে না। বরং যখন আর লাশটা নেই, কোনো কারণে ঈশ্বরই তার হয়ে সরিয়ে দিয়েছে, তখন সবাইকে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে কাল। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে, স্যামসনকে। স্যামসনকে পাওয়া যাবে না, আসলে বন্দুকটা যদি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়।

রাতে ওরা বেশ বড় বড় গাছের গুঁড়ি কেটে আগুন জ্বেলেছিল। সাতটা ছাগলের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে কাঠের আগুনে রোস্ট করা হল। কিছু নেশাভাঙও ছিল, যাতে মানুষগুলো বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতে পারে। খেয়েদেয়ে প্যাংকো সবার ওপরের টিলায় শুয়ে থাকল। ওর ঘুম এল না। এবং গভীর রাতেই মনে হল লণ্ঠন হাতে বনের ভেতর থেকে কারা দুলে দুলে বের হয়ে আসছে। প্যাংকোর ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল বুঝি, নেশাটেশা খুব বেশি একটা করে নি। এত বড় একটা দায়িত্ব মাথায়! চতুর না হলে চলে না। সব সময় ভারি সতর্ক থাকতে হচ্ছে তাকে। লণ্ঠনটা দুলছে হাওয়ায়। এবং মনে হচ্ছিল, ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে।

আবিন চাচা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। দ্বীপে সে-ই সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। প্যাংকো আর্ত-চিৎকারে টিৎকারে গেল না। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। অনেক নিচে সে আবিন চাচাকে অন্ধকারে খুঁজতে থাকল। কে কোথায় শুয়ে আছে ঠিক জানে না। এক একটা লোকের সামনে সে যাচ্ছে, টর্চ মারলেই লোকটা ধড়ফড় করে উঠে বসছে, তার পর ভয়ার্ত চোখে যখন দেখছে, সামনে প্যাংকো সাব দাঁড়িয়ে, নির্ভাবনায় ঘুমে আবার ঢলে পড়ছে।

প্যাংকো এটা দেখে বেশ উৎফুল্লই হচ্ছিল। স্যামসনের মতো সে আবার যীশুরাজের পরেই স্বাস্থ্যবান মানুষ হয়ে যাচ্ছে। তারা তাকে ধর্মাবতার ইতিমধ্যে বলে ফেলেছে, কিন্তু যার দৌলতে ধর্মাবতার, সেটাই তার নাগালের বাইরে। যেমন খাওয়া দাওয়া হলে সে বলেছিল, স্যামসন আজ হোক কাল হোক বনের ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে। এই আসবে কথাটাই যথেষ্ট। এবং রাতে ঘুরে ফিরে ওর মনে হল, আসবে বলে, সে এবং তার উত্তরপুরুষ দ্বীপে শতাব্দী পার করে দিতে পারবে অনায়াসে। ঠিক ঈশ্বরের মতো, অথবা জুজুর ভয়ের মতো, স্যামসনকে দেখা গেছে এক রাতে—ব্যাস, তারপরই যত বিপ্লব, সব নিমেষে ছত্রখান। আবার শতাব্দী পার করে দাও।

কিন্তু দূরবর্তী আলোটাকে নিয়েই খুব মুশকিলে পড়া গেল। সবাইকে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তারপর যখন সবাই বলবে, ওটা কি, ওটা লণ্ঠন, লণ্ঠনও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, একটা ফসফরাসের পিণ্ড যে বাতাসে ভেসে আসছে না কে বলবে, অথবা কোনো অশুভ আত্মা-ফাত্মা, কত কিছুই তো হতে পারে—আবিন চাচাকেই দরকার—এবং এই লোকটাই এদের নেতা গোছের মানুষ, তাকে হাতে রাখা দরকার, সেই প্যাংকোর হয়ে জবাব দিক, ভুলভাল হলে পরে শুধরে নেওয়া যাবে। সে যত পারছে লাফিয়ে দৌড়ে, কখনও নিচে-উপরে খুব সন্তর্পণে কেউ জেগে না যায়, ঠিক এমনিভাবে মুখে মুখে টর্চ মেরে দেখে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের সাঁ সাঁ বাতাস মাথার ওপরে বয়ে যাচ্ছে, এত জোরে হাওয়া উঠছে, অথচ আলোটা বিন্দুমাত্র টাল খাচ্ছে না। ঘোড়াটার কাছাকাছি থাকতে পারে আবিন, আবিনের আগে ভালো করে বরং ঘোড়াটাকেই খোঁজা দরকার। তখনই মনে হল, সেই দূরবর্তী আলো একেবারে কাছে এবং মানুষের মতো ছায়ামূর্তি। ওরা সমুদ্রের জলে নেমে যাচ্ছে। প্যাংকো আর টর্চ জ্বালাতে সাহস পেল না। দেখল সমুদ্রের গভীর জল থেকে ওদের

একজন কাঠের কিছু একটা ভাসিয়ে নিয়ে এল। প্যাংকো এবারে বুঝতে পেরে শিশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল, জন সামসের! আর্তনাদে সবাই জেগে গেল উপত্যকায়। ওরা দেখল, বেলাভূমিতে লণ্ঠন হাতে তিনটি ছায়ামূর্তি। ওদের চিনতে কষ্ট হলো না কারো। আবিন চাচা ডাকল, সামসের!

সামসের আবিন চাচার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। বন্দুকটা পায়ের কাছে রেখে দিল। সাবিনা এবং ভিনদেশীকে দেখিয়ে বলল, চাচা, ওরা এ দ্বীপে আজ থেকে থাকবে, যদি অনুমতি দেন।

আবিন চাচা তাকাল, প্যাংকোর দিকে। প্যাংকো বলল, নিশ্চয় থাকবে। দেশের মেয়ে নিয়ে ভেগে যাক আমরা চাই না।

সামসের বলল, আবিন চাচা কামারুর আটগণ্ডা বেড়াল নিয়েই এখন যত দায় আমাদের!

প্যাংকো বলল, কেন? সবাই একটা করে নিয়ে যাব। পোষা জীব, ওরাই বা যাবে কোথায়!

চাচা বলল, পোষা জীব আসকারা পেলে কি হয় দেখলে তো প্যাংকো সাব!

প্যাংকো বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ! সমস্ত বেড়ালগুলোই তা হলে?

চাচা ফের বলল, মানুষের জন্য কিছু নিয়ম-কানুন দরকার। সবাইকে সেটা মানতে হয়।

—সে তো হয়ই। প্যাংকো টুপি খুলে চাচার পায়ের নিচে রেখে দিল। আর কোনো কথা বলল না। বুড়ো মানুষটার পায়ের নিচে বসে থাকতে সত্যি খুব একটা খারাপ লাগছে না। নিজেকে ভারি স্বাধীন মানুষের মতো মনে হচ্ছে। বলল, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে সবাই আর একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নেই। সকালে রওনা হলে ক্ষতি কি! আবিন চাচা হাসলেন। প্যাংকো বালকের মতো চেঁচিয়ে বলল, সবার এখন একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। সামসের, তুমিও ঘুমিয়ে নাও।

ভিনদেশীর দিকে তাকিয়ে বলল, ওহে ছোকরা, খুব তো ফাজিল হয়েছ! যাও আর দাঁড়িয়ে থেক না। ওদিকে বেশ সুন্দর ঘাসের বিছানা। অনেকদিন তো বেশ পালিয়ে ছিলে, ভেবেছিলে আমরা কিছু বুঝি না। যাও, সাবিনা তুমিও যাও, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও। নরম ঘাসে ঘুমোতে খুব ভালো লাগে।

তারপর মনে হল একজন ভালো মানুষ শুধু এই দ্বীপে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আবিন চাচা। প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা ফেলে দেবেন। পরে মনে হয়েছে, ফেলে দেবার সময় আসে নি, কার কখন কি দুষ্টুবুদ্ধি গজিয়ে উঠবে! আর নূতন একটা জীবনে অভ্যস্ত করাতেও তো সময় লাগে। ততদিন ওটা রাখা নিতান্তই দরকার বলে রেখে দেওয়া।

তিনি দেখতে পেলেন, অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে সাবিনা। ভিনদেশীর হাত ধরে নক্ষত্রের আলোতে একটা সবুজ ঘাসের উপত্যকা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা।